১২ জানুয়ারি ২০২৫

আনন্দলোক



স্মরণে

শ্যাম বেনেগল

আনন্দলোক পুরস্কার ২০২৫-এ নমিনেশন পেলেন কারা?



জন্মশতবর্ষে

মহম্মদ রফি

সারাজীবন নিজের গানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে গিয়েছেন **মহম্মদ রফি**। অথচ শেষে সেই ঈশ্বরের জন্যই ছাড়তে গিয়েছিলেন গান! অনন্য সঙ্গীত সাধকের জন্মশতবর্ষে আনন্দলোকের শ্রদ্ধার্ঘ্য



আরও আনন্দ | ORIGINALS
হেমেন্দ্র কুমার রায়ের গল্প অবলম্বনে
বাঁদরের পা
পরিচালনা: সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় | চিত্রনাট্য: অভিরূপ ঘোষ
দেখুন 'আনন্দপ্লেক্স'-এ
ইনস্টল করে সাবস্ক্রিপশন করলেই আপনার জন্য থাকছে এমনই
আরও ওয়েব সিরিজ়-সহ বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে
অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda
ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas

আনন্দলোক কোথায় কী
৫০ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ১২ জানুয়ারি ২০২৫

কভার ড্রাইভ



পেশা হিসেবে বাছতে হয়েছিল ক্ষৌরকর্মকে। কিন্তু গান যাঁকে বেছে নিয়েছে, তিনি অন্য কোনও কিছু করবেন কী করে? মহম্মদ রফি সারাজীবন নিজের গানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে গিয়েছেন। শেষে সেই ঈশ্বরের জন্যই ছাড়তে গিয়েছিলেন গান!

তাঁর আপত্তি ছিল ‘সমান্তরাল ছবি’ শব্দবন্ধে। অথচ সেই ধারার ছবিরই পোস্টারবয় শ্যাম বেনেগল, চেতনা এবং বিনোদন যাঁর ছবিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেছে



স্মৃতিচারণা

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জাহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by
Zahra Basrai on behalf of
ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V
Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 50, Issue 24th
RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন www.anandalok.in-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp



■ অল্লু অর্জুন

অর্জুনের রাজত্ব

দক্ষিণী ছবি নিয়ে সিনেমাপ্রেমীদের আগ্রহ বরাবরই বেশি। 'পুষ্পা টু' মুক্তি পাওয়ার পর দর্শকদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু তা নিয়ে এত বিস্তারিত প্রতিবেদন আগে পড়িনি। অল্লু অর্জুনের অভিনয় দক্ষতা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা হল। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হয়েছে লেখায়, যা প্রশংসনীয়।

শ্রেষ্ঠা বসু, যাদবপুর



উস্তাদের কথা

এত ভাল স্মরণ হয়তো খুব কমই পড়েছি। লেখনীতেই মন ছুঁয়ে যায়। উস্তাদ জ়াকির হুসেনের তালবাদ্যকে সম্মান জানাতে এর চেয়ে ভাল লেখা আর হয়তো হতে পারে না।

মেঘা বিশ্বাস, বাঁকুড়া

ক্রাউনে চোখ

বছর শেষে প্রতিবারই চোখ থাকে এই বিশেষ বিভাগে। মজার ছলে ফিরে দেখি পুরনো বছরকে। কারা কারা জায়গা করে নিলেন এই বিভাগে, তা দেখতে মুখিয়ে থাকি। এবারের লেখাগুলোও বেশ ভাল লাগল।

প্রদীপ মণ্ডল, বারাসত

যথাযথ প্রশ্ন

খোলামেলা আলাপচারিতা, সর্বোপরি যথাযথ প্রশ্ন। রাজ-শুভশ্রীর ইন্টারভিউটা পড়ে বেশ ভাল লাগল। এরকম একটি প্রশ্নোত্তর পর্বের প্রয়োজন ছিল এই সময়ে দাঁড়িয়ে।

ঋজু ভৌমিক, দুর্গাপুর

চর্চায় বাংলাদেশ

বিগত কয়েক মাসে সর্বত্র শিরোনামে বাংলাদেশ। কিন্তু এই ঘটনায় বিনোদন জগতের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন খুব কমই পড়েছি। সেখানকার তারকারা লিখেছিলেন ঠিকই। তবে অনেকটা সময় পর আবার সেই বিষয়ে আরেকটি প্রতিবেদন। এরকম একটি বিষয়ে প্রতিবেদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাবেরী দে, বাঁকুড়া



■ কৌশানী মুখোপাধ্যায়



■ রাজ-শুভশ্রী



■ 'ভূতপরী' ছবির একটি দৃশ্যে জয়া

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in





মহম্মদ রফি
এক সাধকের শতবর্ষ

পেশা হিসেবে বাছতে হয়েছিল ক্ষৌরকর্মকে। কিন্তু গান যাঁকে বেছে নিয়েছে, তিনি অন্য কোনও কিছু করবেন কী করে? **মহম্মদ রফি** সারাজীবন নিজের গানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে গিয়েছেন। শেষে সেই ঈশ্বরের জন্যই ছাড়তে গিয়েছিলেন গান! কেন? জন্মশতবর্ষে পা দেওয়া এই সঙ্গীত সাধকের জীবনকে ফিরে দেখলেন **সায়ক বসু**

প্লেব্যাক তিনি করতে নাও পারেন শুনে সুরকার মদনমোহন বলেছিলেন, ওই নির্দিষ্ট ছবিতে সুরের কাজ ছেড়ে দেবেন! শংকর জয়কিষেণের মতো সুরকার প্রায় ২০০টি গান গাইয়েছিলেন তাঁকে দিয়ে। লতা মঙ্গেশকর একটা সময় তাঁর উপরে এত রেগে গিয়েছিলেন যে একসঙ্গে গান করবেন না বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষে তাঁর অমোঘ আকর্ষণ উপেক্ষা করার সেই পণ আর ধরে রাখতে পারেননি। কিশোরকুমার অবধি ছবিতে তাঁর গাওয়া গানে লিপ দিয়েছেন! দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তাঁকে বাড়িতে ডেকে এনে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন শুধু একটি গান শুনে। সঞ্জয় গান্ধী এই শিল্পীকে এত পছন্দ করতেন যে, শুধু তাঁর একটি অনুরোধে কিশোরকুমারের উপর যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিলেন...

আজ সত্যিই মনে হয়, মহম্মদ রফি নামক শিল্পীটি যদি আমাদের দেশে না থাকতেন, তাহলে হয়তো 'অজাতশত্রু' শব্দটার সঠিক মানে আমাদের বোঝা হয়ে উঠত না। কিছুদিন আগেই জন্মশতবর্ষ পূরণ করেছেন (২৪ ডিসেম্বর) দেশের এই অন্যতম জনপ্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ গায়ক। গুরুত্বপূর্ণ শুধু তাঁর গানের জন্য নয়, এমন এক সাধারণ জীবনচর্যের জন্য, যা এখনও সমান শিক্ষণীয় এবং অনুকরণযোগ্য।

প্রথম গুরু, মাধুকরী

মাঝে মাঝে মনে হয়, সঙ্গীত-ঈশ্বর বোধহয় সত্যিই আছেন। নয়তো তিনি তাঁর মানসপুত্রকে অদ্ভুতভাবে খুঁজে বের করেন কী করে? কিভাবে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁকে ঠিক জায়গা করে দেন, নিজের কাজটি মন দিয়ে করে যাওয়ার জন্য? ১৯২৪ সালে অমৃতসরের মাঝিঠা নগরের কোটলা সুলতান সিং গ্রামের যে বাড়িতে মহম্মদ রফি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেখানে গান গাওয়ার কোনও পরিবেশ ছিল না। সঙ্গতি তো ছিলই না। একে তো দরিদ্র পরিবার, পাশাপাশি বাবা-মা এবং আট ভাই বোনের সংসারে অর্থ রোজকারটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিল।। তার ওপর রফির বাবা হাজি আলি ছিলেন সনাতনী

মুসলিম। গান বাজনাকে নেহাত ‘নাপাক’ বলে মনে করতেন। তার মধ্যেও সাত বছরের ছোট্ট রফি, ডাকনাম ফিকো, খুঁজে পেয়েছিল তার গানের গুরুকে। সুরের প্রতি টান শুরু হয়েছিল তখন থেকেই। এক বৃদ্ধ ফকির। গ্রামের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তিনি গান গাইতেন এবং ভিক্ষাবৃত্তি করতেন। ফকিরের গলায় ‘খেডন দে দিন চার ও মাইয়ে’ গানটি শুনে ওই বয়সেই তুলে নিয়েছিল ফিকো। স্পষ্ট সুর এবং কথা... বৃদ্ধ ফকির যেদিন গান গাইতে পারতেন না, ওইসব দিনে ফিকো গেয়ে দিত ওঁর হয়ে। তবে শঙ্কা একটা ছিল, বাবা যেন কোনওদিন ওই গানের কথা জানতে না পারে। তবে বেশিদিন ওই গ্রামে তার থাকা হল না।

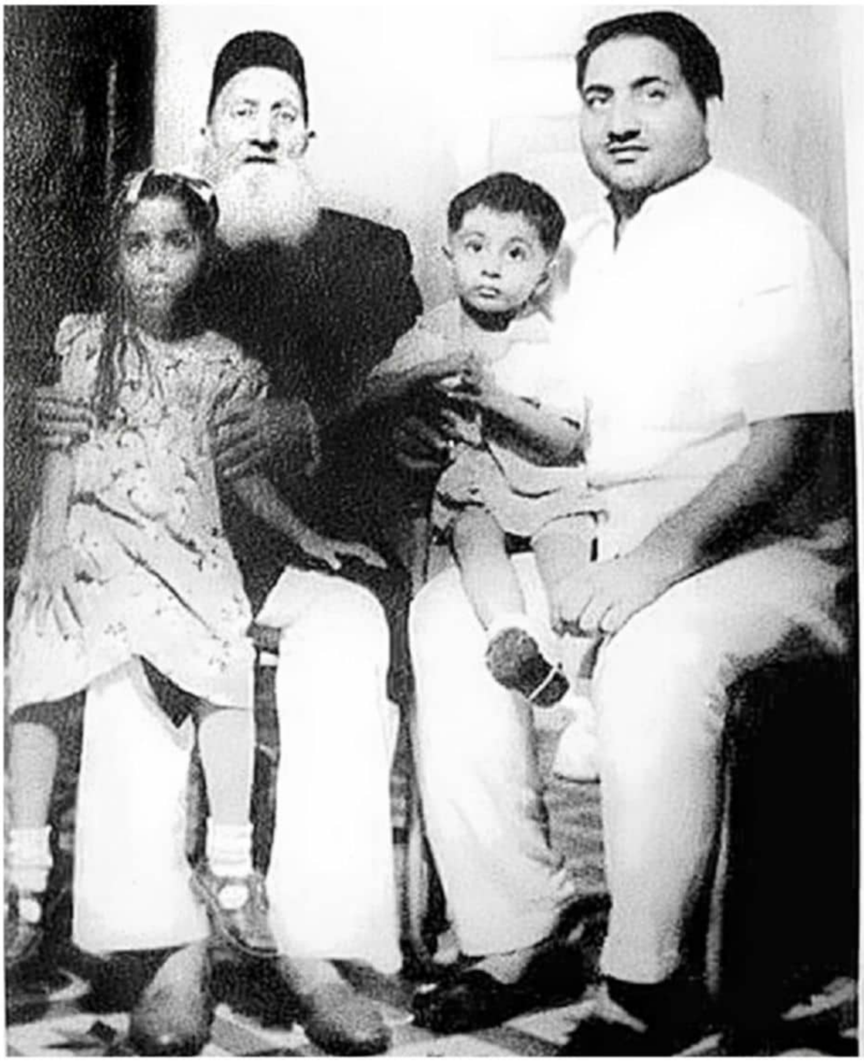
নাপিত, আকাশবাণী ও ভাগ্যের চাকা

ভাগ্যান্বেষণের সূত্রে হাজি আলি তাঁর স্ত্রী আল্লাহ রাখি ও গোটা পরিবারকে নিয়ে ১৯৩৫ সালে চলে গেলেন লাহোরে, যাতে সেখানে কাজ করে কিছু অর্থ রোজগার করে সংসারের সুরাহা করা যায়। সেই সূত্রে ভাটি গেট নূর মহল্লায় একটি সেলুন খোলা হয়। চুল কাটার



■ পিতার সঙ্গে ছোট্ট রফি

ফকিরের গলায় ‘খেডন দে দিন চার ও মাইয়ে’ গানটি শুনে ওই বয়সেই তুলে নিয়েছিল ফিকো। বৃদ্ধ ফকির যেদিন গান গাইতে পারতেন না, ওইসব দিনে ফিকো গেয়ে দিত ওঁর হয়ে। তবে শঙ্কা একটা ছিল...

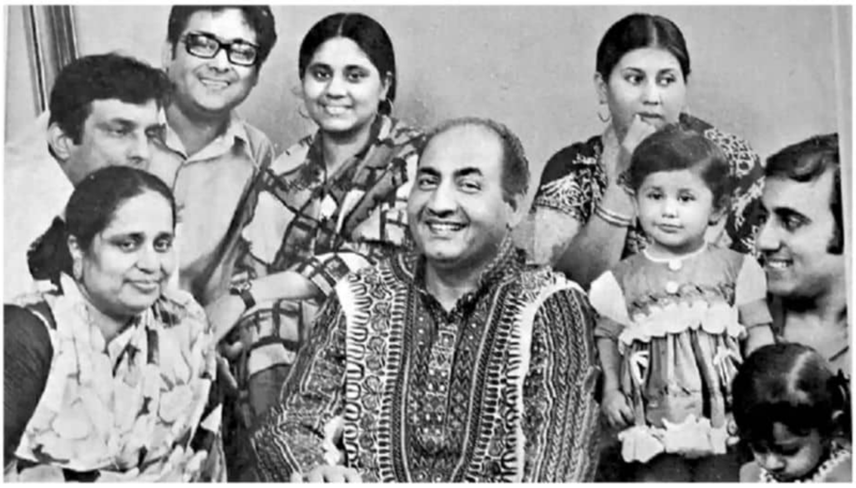


■ পিতার সঙ্গে সন্তানকে নিয়ে



■ লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে গান রেকর্ডিংয়ের আগে

কাজ শুরু করেন রফির দাদা মহম্মদ দিন এবং সেখানে কাজ শিখতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ফিকোকে। ভেবে দেখুন, বাড়ির যা অবস্থা এবং যেরকন গোঁড়া পরিবার, সেখানে সারা জীবন হয়তো চুল কেটে অর্থ রোজগার করেই কাটিয়ে দিতে হতে পারত রফিকে। তিনি চুল কাটার কাজও শুরু করেছিলেন। তবে এখানে সবচেয়ে বড় বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন তাঁর দাদা দিনকে। দিন জানতেন, ভাই খুব ভাল গায়। তাই বাড়ির বিরুদ্ধে গিয়ে, নিজে উদ্যোগ নিয়ে তিনি ভাইয়ের গান শেখার ব্যবস্থা করে দেন। দিনের বন্ধু ছিলেন আব্দুল হামিদ। তাঁর সাহায্যে রফি গান শিখতে শুরু করেন বরকত আলি এবং আব্দুল ওয়াহিদ খানের কাছে।



স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে



মুকেশ, মদন মোহন ও আশা ভোঁসলের সঙ্গে



স্টুডিয়োয় কিশোর, রফি ও অন্যান্যরা

সায়গলের ভক্ত হিসেবে রফি সেখানে দাদার সঙ্গে যান অনুষ্ঠান শুনতে। কিন্তু হঠাৎ করে লোডশেডিং হয়ে যাওয়ায়, সায়গল স্টেজে উঠতে অস্বীকার করেন।

পাশাপাশি চলতে থাকে ছোট ছোট জলসায় গান গাওয়া। আসলে মহম্মদ দিন চেয়েছিলেন রফি যাতে নিজের পছন্দের কাজটা করে অর্থ রোজগার করতে পারে। তাই ভাইয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। এমন একটি সময় অদ্ভুতভাবে ঘটে ঘটনাটা। ওই সময় আকাশবাণীর আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে গান গাইতে আসার কথা ছিল কে এল সায়গলের। সাধারণ দর্শকের জন্য অনুষ্ঠান। সায়গলের ভক্ত হিসেবে রফি সেখানে দাদার সঙ্গে যান অনুষ্ঠান শুনতে। কিন্তু হঠাৎ করে লোডশেডিং হয়ে যাওয়ায়, সায়গল স্টেজে উঠতে অস্বীকার করেন। বললেন আলো এলে গান শোনাবেন। ফলে হঠাৎ করে গান শোনানোর সুযোগ এসে যায় রফির কাছে। দাদার অনুরোধে সেদিন কারেন্ট আসা পর্যন্ত গান শুনিয়েছিলেন রফি। সায়গল ভীষণ খুশি হন গান শুনে এবং রফিকে খুব আশীর্বাদ করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় সুরকার শ্যাম সুন্দরও। তিনিও রফির গানে এতটাই মোহিত হয়ে যান যে, ছোট্ট শিল্পীকে একটি প্লেব্যাকের অফার দিয়ে বসেন! ১৯৪২-’৪৩ সালে পাঞ্জাবি ছবি ‘গুল বালোচে’-তে জিন্নত বেগমের সঙ্গে একটি গান করেন মহম্মদ রফি। সেটির পরে, আকাশবাণীতে নিয়মিত গান করার সুযোগও পান। অনুষ্ঠান



■ শিল্পীদের একটি অনুষ্ঠানে সকলে একসঙ্গে

আরও বাড়তে থাকে। কিন্তু ততদিনও পিতা হাজি আলির কাছে রফির গান গাওয়ার বিষয়টা অজ্ঞাত ছিল। মুশকিল হল, লাহোরের একটি অনুষ্ঠানে তখনকার দিনের জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী নাজ়ির এবং স্বর্ণলতার আগমনে। রফির গলা তাঁদের এত পছন্দ হয় যে, তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে দিয়ে গাওয়ানোর কথা ভাবেন। কিন্তু রফি বলেন, এত বড় ছবিতে কাজ করার জন্য তাঁকে বাবার অনুমতি নিতে হবে। খুব ভাল হয়, যদি স্বর্ণলতা নিজে গিয়ে হাজির সঙ্গে কথা বলেন। স্বর্ণলতা তা-ও করেন, কিন্তু হাজি রাজি হননি। অবশেষে ফের ত্রাতা হিসেবে দেখা দেন মহম্মদ দিন। পিতাকে তিনি কোনওভাবে রাজি করান এবং রফি স্বর্ণলতার 'লয়লা-মজনু' ছবিতে শুধু গান নয়, অভিনয়ও করেন!

যুদ্ধের আগুন, পড়ল ফোসকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনে তখন পুড়ছে গোটা বিশ্ব। লাহোরেও তার আঁচ একটু-একটু করে পড়ছে। তার মধ্যেই পিতার জোরাজুরিতে রফিকে বিয়ে করতে হল। স্ত্রীর নাম বসিরা বিবি। কিন্তু বিয়ে করলেই তো হল না, রোজকার হবে কী করে? ততদিনে অবশ্য রফির দাদা এবং সেই বন্ধু আব্দুল হামিদ ঠিক



■ মহম্মদ রফি

করে নিয়েছেন, গানকে রফি পেশা হিসেবে বাছবে। তাই একদিন সমস্ত স্নেহ মায়া মমতার সুতো কেটে হামিদের সঙ্গে রফিকে চলে আসতে হল মুম্বই (তৎকালীন বম্বে)। উদ্দেশ্য সেই, ভাগ্যান্বেষণ। যদিও মুম্বইতে আসার আগে তিনি একবার লখনউতে গিয়েছিলেন। জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী নওশাদের পিতার



■ স্ত্রীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে

সঙ্গে দেখা করতে এবং তাঁকে গান শোনাতে। নওশাদের পিতার চিঠি নিয়ে রফিরা মুম্বইতে চলে এলেন ভেন্ডি বাজার এলাকায়। এখানে একটি দশ বাই দশের ঘর ভাড়া করে রফি কাজ খুঁজতে শুরু করলেন। নওশাদের কাছে গিয়ে তাঁর পিতার চিঠিটা দিলেন। নওশাদ প্রথমে খুব একটা পাত্তা দেননি। কিন্তু পরে



সুরের সাধনা



সলিল চৌধুরীর সঙ্গে

রফির গান শুনে চমকিত হয়ে যান। তিনি বলেন, রফিকে থেকে যেতে। কিন্তু কাজ দিতে পারেননি। প্রথমে বলেন, একটি কোরাসে রফির গলা তিনি ব্যবহার করবেন। ছবিটির নাম ছিল 'পেহলে আপ'। এবং গানটি, 'আর্মি হম হ্যায়।' একটি মাইক্রোফোনে তিনজন করে গায়ক দাঁড় করিয়ে, তাঁদের পায়ে বুট পরিয়ে নওশাদ গানটি রেকর্ড করেছিলেন। শর্ত ছিল গানটি গাওয়ার সময় সৈন্যদের মার্চ করার মতো আওয়াজ করতে হবে বুট দিয়ে। বহুবার রিটেকের পর গানটি যখন শেষে ফাইনাল রেকর্ড হয়, দেখা যায় রফিদের পায়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছে! অবশ্য তাতে রফির কোনও সমস্যা হয়নি। তখন তাঁর কাজ পাওয়া নিয়ে কথা। অবশ্য যাঁর এত প্রতিভা, গলায় স্বয়ং ঈশ্বরের বাস, তাঁকে ঠেকায় কার সাধ্য? রফির গান প্রথম হিট করে দিলীপকুমার অভিনীত 'জুগনু' ছবিতে। তাঁর গান জনমানসে এত প্রভাব ফেলে যে, তখনকার দিনের জনপ্রিয় এবং ব্যস্ততম গায়িকা নূরজাহানের সমান পারিশ্রমিক পেতে শুরু করেন রফি! 'জুগনু'তেও অভিনয় করতে হয় তাঁকে, আবার। তবে যেহেতু তখন রফিকে একটু একটু করে লোকে চিনতে শুরু করেছে, তিনি নিজের মত প্রকাশ করেন। সিনেমায়

বহুবার রিটেকের পর গানটি যখন শেষে ফাইনাল রেকর্ড হয়, দেখা যায় রফিদের পায়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছে! অবশ্য তাতে রফির কোনও সমস্যা হয়নি।

আর কোনওভাবেই মুখ দেখাবেন না বলে ঠিক করে নেন। কারণ গাদা গাদা মেকআপ করতে হয় যে! সেটা একেবারেই না-পসন্দ তাঁর। তাই বলে দেন এবার থেকে শুধু প্লেব্যাক করবেন। তবে এর মধ্যে রফির কিছু স্বপ্নপূরণ হতে থাকে। কোরাসে গান গাওয়া তখনও কমেনি। তবে স্বপ্নের নায়ক কে এল সায়গলের 'শাহজাহান' ছবিতে তিনি কোরাসে গাওয়ার সুযোগ পান।

দেশভাগ, গান্ধী ও নতুন সম্পর্ক

এর মধ্যে আসে ১৯৪৭ সাল। দ্রুত পট পরিবর্তন হতে থাকে। কে এল সায়গলের মৃত্যু হয়। দেশ স্বাধীন হয় এবং দেশভাগও হয়। আর দেশভাগের এই ক্ষত আরও বাড়িয়ে দেয়

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। লাহোরে এই পরিস্থিতির জেরে, হিংসায় নিহত হন রফির শ্বশুর ও শাশুড়ি। রফি তখনই ঠিক করেন, বাড়ির সবাইকে লাহোর থেকে এই দেশে নিয়ে চলে আসবেন। কিন্তু বেঁকে বসেন রফির স্ত্রী বসিরা বিবি। তিনি কিছুতেই আসতে চাইলেন না ভারতে। ছেলে সইদকে নিয়ে থেকে গেলেন ওপারে। আর উপায়ান্তর না দেখে রফিকে বাড়ির বাকি সদস্যদের নিয়ে চলে আসতে হল মুম্বই। এই প্রসঙ্গে একটি গানের কথা বলতে হয়। গানটির প্রথম লাইনটি ছিল, 'শুনো শুনো অ্যায় দুনিয়াওয়ালো বাপু কি ইয়ে কহানী'। ১৯৪৮ সালের মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পর এই গানটি তৈরি হয় এবং রফি তাতে গলা দেন। বলতে বাধা নেই, এতদিন প্লেব্যাক করে যা রফি পাননি, তাই যেন পেয়ে গেলেন এই একটি গানের মাধ্যমে। এক মাসে গান্ধীজীর গুণকীর্তনওয়ালা এই গানের এক লক্ষ রেকর্ড বিক্রি হয়! গোটা দেশের 'স্বর' হয়ে ওঠেন



■ কিশোরের সঙ্গে ছিল নির্ভেজাল বন্ধুত্ব। (নীচে) প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে



আনন্দলোকের পছন্দের সেরা ২০

১. মধুবন মেঁ রাধিকা নাচে (কোহিনূর, ১৯৬০)
২. চৌদভিঁ কা চাঁদ (চৌদভিঁ কা চাঁদ, ১৯৬০)
৩. ইয়ে রেশমী জুলফেঁ (দো রাস্তে, ১৯৬৯)
৪. পুকারতা চলা হুঁ ম্যায়ঁ (মেরে সনম, ১৯৬৫)
৫. দিন ঢল জায়ে (গাইড, ১৯৬৫)
৬. অভি না যাও ছোড় কর (হম দোনো, ১৯৬১)
৭. বাহারোঁ ফুল বরসাও (সুরজ, ১৯৬৬)
৮. গুলাবি আঁখেঁ (দ্য ট্রেন, ১৯৭০)
৯. এহসান তেরা হোগা মুঝ পর (জংলী, ১৯৬১)
১০. খোয়া খোয়া চাঁদ (কালা বাজ়ার, ১৯৬০)
১১. তুম জো মিল গয়ে হো (হসতে জ়খম, ১৯৭৩)
১২. তারিফ করুঁ কেয়া উসকি (কশ্মীর কী কলি, ১৯৬১)
১৩. জো ওয়াদা কিয়া উয়ো (তাজমহল, ১৯৬৩)
১৪. চাহুঙ্গা ম্যায়ঁ তুঝে (দোস্তি, ১৯৬৪)
১৫. তেরি আঁখোঁ কে সিভা (চিরাগ, ১৯৬৯)
১৬. চুরা লিয়া হ্যায় (ইয়াদোঁ কী বারাত, ১৯৭৩)
১৭. কেয়া হুয়া তেরা ওয়াদা (হম কিসি সে কম নহী, ১৯৭৭)
১৮. আজ মৌসম বড়া বেইমান হ্যায় (লোফার, ১৯৭৩)
১৯. দিল কে ঝরোখে মেঁ (ব্রহ্মচারী, ১৯৬৮)
২০. চাঁদ মেরা দিল (হম কিসি সে কম নহী, ১৯৭৭)

রফি। স্বয়ং জহরলাল নেহেরু পর্যন্ত তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রজত পুরস্কার দান করেন এবং দেশের প্রথম স্বাধীনতার দিনে তাঁকে দিয়ে গানটি গাওয়ান।

ঈশ্বরদত্ত, সুরকারদের প্রিয়

মহম্মদ রফি কোনওদিন ভাবতেন না যে, গান তিনি নিজে গাইছেন। তাঁর সব সময় মনে হয়েছে, ঈশ্বর তাঁকে দিয়ে গাইয়ে নিচ্ছেন। তাই তিনি গানকে খুব স্বাভাবিকভাবেই আপন করে নিয়েছেন। গানও তাই করেছে। কারণ গান্ধীর গান সংক্রান্ত এই ঘটনাটা ঘটার পর রফির কাছে আসে 'সুহানি রাত ঢল চুকি' নামক গানটি। এই প্রজন্মের গানপ্রিয় মানুষদেরও নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না এই গানটির জনপ্রিয়তার কথা। রফি রাতারাতি দেশের



■ স্ত্রীর (দ্বিতীয়) সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে

প্রথমসারির গায়ক হিসেবে উঠে আসেন। এবং সুরকারদের অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। সেটা খানিকটা তাঁর মিষ্টভাষী স্বভাবের জন্যও। পাঁচের দশকের জনপ্রিয় ছবি 'বৈজু বাওরা'র কথা অনেকেই জানেন। এই মিউজ়িকালের সুরকার নওশাদ প্রথমে ঠিক করেছিলেন, তালাত মাহমুদকে দিয়ে ছবির গানগুলি গাওয়াবেন। তালাত রাজিও ছিলেন। কিন্তু নওশাদ একদিন রাস্তায় তালাতকে সিগারেট খেতে দেখে ফেলেন! এবং এতটাই রেগে যান যে, রাতারাতি তালাতকে সরিয়ে রফিকে নিয়ে আসেন বৈজুর গানগুলো গাওয়াতে। আর তাতেই তৈরি হয় বেশ কিছু ইতিহাস এবং কিংবদন্তি। 'মন তড়পত' গানটি প্রকাশের পর স্বাধীন ভারতের হিন্দুদের কাছে প্রায় প্রার্থনা সংগীতের মতো হয়ে যায়। হেন কোনও মন্দির বা গুরুদ্বার ছিল না, যেখানে এই গানটা বাজত না। অথচ দেখুন, গানটি শাকিল বদায়ুনি, রফি এবং নওশাদের মতো তথাকথিত মুসলমানদের হাতেই তৈরি! রফির গলা সেই সময় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের কাছে দেশভাগের ক্ষতের প্রলেপ হয়ে দেখা দেয়। এই ছবিতে আরেকটি গান আছে। 'অ্যায় দুনিয়া কে রাখওয়ালে।' শোনা যায়, এই গানটি তার সপ্তকে গাইতে গিয়ে রফির গলা থেকে রক্ত পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছিল! তিনি মাসখানেক তারপরে আর গান গাইতে পারেননি। কিন্তু তাও এই গানে ঠিক যতটা আবেগ এবং উচ্চারণ স্পষ্ট হওয়ার কথা, ঠিক ততটাই দিয়েছিলেন রফি। আসলে গানের জন্য বরাবরই সমর্পিত ছিলেন এই গায়ক। যেন ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য দান করছেন। তাই গানের প্রতি প্রেম ও পূজাকে কোথাও যেন মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। রফির গানের মূল্যায়ণ করলে বিশেষজ্ঞদের মুখ থেকে দু'টি কথা প্রায় সব সময় শোনা যায়। এক তো স্পষ্ট উচ্চারণ এবং দুই, যে গায়কের জন্য তিনি গানটি গাইতেন, পর্দায় শুনলে মনে হত সেই নায়কই যেন সত্যি-সত্যি গানটি উচ্চারণ করছেন। রফির গাওয়া 'ইয়াহু' গানটি শুনলে যে মনে হয় শাম্মী যেন নিজের গলা থেকে সুর ও কথা বের করছেন, সেটা কি অস্বীকার করা যায়? বা 'সর যো তেরা চকরায়ে' গানটির আদত গায়ক যে রফি নন, অভিনেতা জনি ওয়াকার, তা তো অনেকেই বিশ্বাস করেন এখনও! আসলে এক অভাবনীয় প্রতিভা নিয়ে রফি প্লেব্যাক সিঙ্গিং জিনিসটিকে একটি শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলা যেতে পারে। রমজ়ান চলাকালীন 'জঞ্জীর' ছবির জন্য একটি গান গেয়েছিলেন রফি। 'দিওয়ানি হ্যায় দিওয়ানো কো'। পরে যখন জানতে পারেন সিনেমায় গানটি অভিনেতা গুলশন বাওরার লিপে দেখানো হবে, তখন রোজা রাখা সত্ত্বেও ফের স্টুডিওতে গিয়ে গানটি রেকর্ড করেন তিনি। কারণ রফির বক্তব্য ছিল, তিনি অমিতাভ বচ্চনের কথা মাথায় রেখে গানটি গেয়েছিলেন। ভাবুন, একটা মানুষ পারফেকশনের ঠিক কোন জায়গায় গেলে এমন কাজ করতে পারেন! সেই কারণে হয়তো সুরকাররাও রফির জন্য প্রাণপাত করে দিতে পারতেন। ওপি নাইয়ার যেমন, রাজ কপূর অভিনীত 'দো উস্তাদ' নামের ছবিতে রফিকে দিয়ে গান গাওবেন বলে ভেবেছিলেন। এদিকে রাজের পছন্দ ছিলেন মুকেশ। তিনি বারবার জোর দিতে থাকেন মুকেশকে দিয়ে গান রেকর্ডিং করানোর জন্য। কিন্তু নাইয়ার রফির ব্যাপারে এতটাই মরিয়া



■ স্ত্রী বিলকিস ও সেই বন্ধু আব্দুল হামিদ

সুরকার নওশাদ প্রথমে ঠিক করেছিলেন, তালাত মাহমুদকে দিয়ে ছবির গানগুলি গাওয়াবেন। কিন্তু নওশাদ একদিন রাস্তায় তালাতকে সিগারেট খেতে দেখে ফেলেন! এবং রেগে গিয়ে রফিকে নিয়ে আসেন ওই জায়গায়।

ছিলেন যে, ছবির প্রযোজককে গিয়ে নিজের অ্যাডভান্সটা পর্যন্ত ফেরত দিয়ে আসতে চেয়েছিলেন! তাঁর বক্তব্য ছিল, রফিকে না গাওয়ালে তিনি ছবির কাজ করবেন না। শেষে রাজকে সেই জেদের কাছে হার মানতে হয় বটে, কিন্তু পরে আর সারাজীবন তিনি ও পি নাইয়ারের সঙ্গে কাজ করেননি।

গানের জন্য না ধর্মের জন্য?

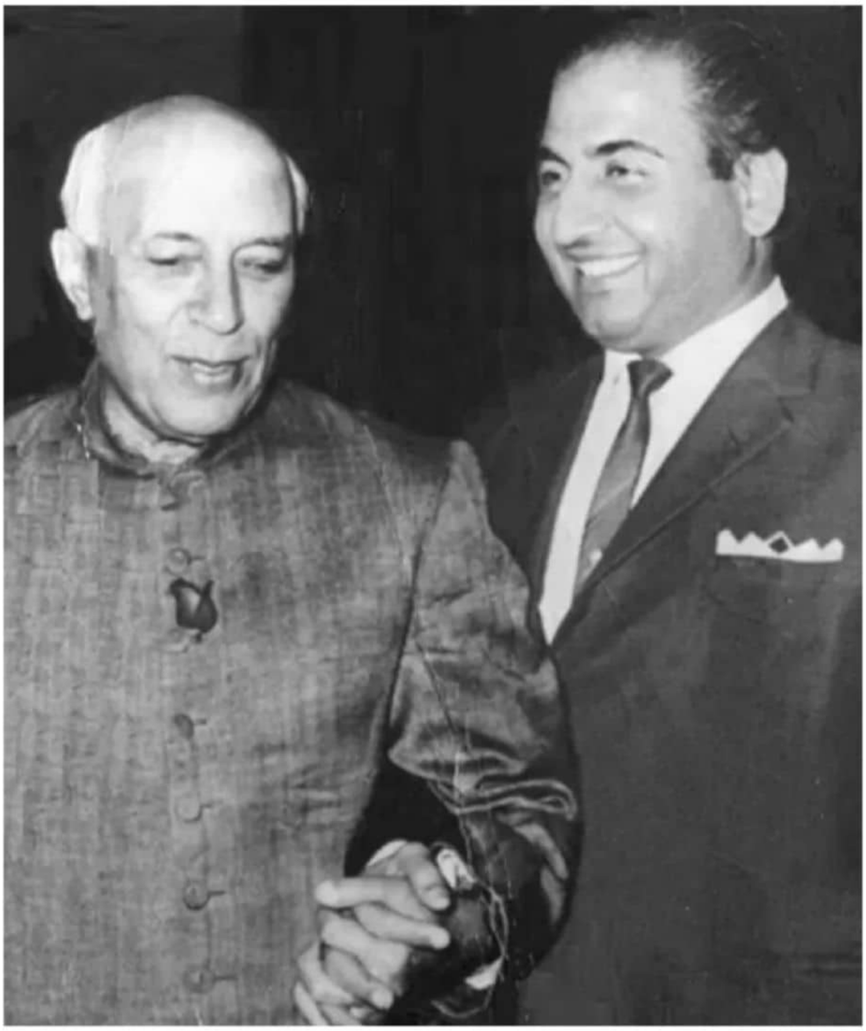
কিন্তু তা বলে রফির সঙ্গে রাজের সম্পর্ক কোনওদিন খারাপ হয়নি। কারণ রাজ জানতেন, এই একটি মানুষ জীবনে গান ছাড়া আর কিছু জানেন না। নাওয়া-খাওয়া অবধি ভুলে যান। তাই তো এই দেশে রফির যখন দেখাশোনার আর কেউ ছিল না, তখন সেই আব্দুল হামিদ জোর করে তার দ্বিতীয় বিয়ে দেন নিজের শ্যালিকার সঙ্গে। বিলকিস বানো। তাঁর সঙ্গে জীবনের শেষ দিন অবধি ছিলেন রফি এবং কোথাও গিয়ে মনে হয় আধ্যাত্মবাদই তাঁকে ঈশ্বরে বিলীন করে দিল। রফি যে সারা জীবন খুব সনাতন, ধর্মপ্রাণ

> যিনি ভারতীয় সংগীতের এত ধারায় বিচরণ করেছেন এত ধরনের গান গেয়েছেন, তার ধর্মীয় বিশ্বাস একটি নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি এত তীব্র হল কী করে? গানকেই তো সারাজীবন ঈশ্বর বলে মেনে এসেছেন তিনি।

মুসলমান ছিলেন, তা সকলেই জানেন। নিয়মিত নমাজ় পড়তেন, সব আচার মেনে চলতেন। রমজ়ানের সময় 'সঙ্গীতা' বলে একটি ছবির গান ছেড়ে দিয়েছিলেন, কারণ ওই গানের লাইন ছিল 'হুক্কে মে ধুঁয়া'। রমজ়ানের পবিত্র মাসে কোনও নাপাক শব্দ উচ্চারণ করবেন না বলেই এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু যিনি ভারতীয় সংগীতের এত ধারায় বিচরণ করেছেন, এত ধরনের গান গেয়েছেন, তার ধর্মীয় বিশ্বাস একটি নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি এত তীব্র হল কী করে? গানকেই তো সারাজীবন ঈশ্বর বলে মেনে এসেছেন তিনি। একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কেরিয়ারের অন্যতম জনপ্রিয় গান 'বাবুল কি দুয়ায়ে লেতি জা' গানটি যখন তিনি রেকর্ড করেছেন, তার দু'দিনের মধ্যে তাঁর মেয়ের বিয়ে ছিল। ফলে অনেক বেশি আবেগ ফুটেছে সেই গানে। তাই জাতীয় পুরস্কারও এসেছিল। 'অমর আকবর



নিজের ছেলের পরিচয় করাচ্ছেন আশা ভোঁসলের সঙ্গে



জওহরলাল নেহেরু ও মহম্মদ রফি



■ ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে

অ্যান্টনি' ছবির 'সিরডি ওয়ালে সাঁই বাবা' গানটি গাওয়ার সময় রফির মনে সিরডির যাবতীয় পরিবেশ, দৃশ্যাবলী মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল। তাই তিনি নিজের গানের প্রশংসা কোনওদিন শুনতে পারতেন না। প্রশংসা সূচক বাক্য শুনলেই তাঁর হাত অজান্তে উপরের দিকে উঠে যেত। সেই রফি কিনা অন্ধবিশ্বাসের বলি হলেন! ১৯৭১ সালে স্ত্রীর সঙ্গে হজ যাত্রায় গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে মৌলবী তাঁকে বলেন, যেহেতু তিনি হাজী হয়েছেন, তাই গান-বাজনা তার এবার বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এরকম 'পাপী' জিনিসের ঘেরাটোপে তাঁর উপস্থিত থাকা আর উচিত নয়। রফি শুধু সেটা বিশ্বাসই করেননি, মুম্বইতে এসে রীতিমত ঘোষণা করে দেন, গান আর তিনি গাইবেন না। ব্যাপারটা বিস্ফোরণের মতো ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইন্ডাস্ট্রিতে! এর কারণ কী? হঠাৎ কী হয়েছিল রফির যে, উপাসনার সবচেয়ে মূল্যবান এবং সহজ পথটিকে তিনি ছাড়তে রাজি হয়েছিলেন? অন্ধ বিশ্বাস নাকি সারল্য? নাকি অন্য কিছু? ইন্ডাস্ট্রিতে থেকে তিনি অজাতশত্রু হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে হতে থাকা রাজনীতি তাঁকে কোনওভাবে আহত করেছে? হতে পারে। গানের রয়েলটি নিয়ে লতার সঙ্গে তাঁর ঝামেলার জল বহুদূর গড়িয়েছিল। কিশোরের সঙ্গে ঝামেলা না থাকা সত্ত্বেও, বারবার খবরের কাগজে লেখা হয়েছে তাদের সম্পর্কের অবনতির কথা। এগুলো রফিকে খুব আঘাত করত সন্দেহ নেই। তাছাড়া ঋষি কপূরদের মতো নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ইন্ডাস্ট্রিতে আসার পর রফির মনে হতে থাকে, তাঁর মত পুরনো গাইয়েদের জায়গা এবার ছেড়ে দেওয়া উচিত। যদিও মদনমোহনের অনুরোধে তিনি 'লয়লা মজনু' ছবিতে ঋষির লিপে গান করেন এবং সেটি হিটও করে, কিন্তু রফির মনে বিশ্বাস আস্তে আস্তে কমছিল। তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন না বটে, কিন্তু মানসিক আঘাত পাচ্ছিলেন। সাতের দশকের পর থেকে রফির শরীর খারাপ হতে শুরু করে। দু'বার হার্ট অ্যাটাকও হয়ে যায়। ফলে মনের জোর পাচ্ছিলেন না। যদিও এই সময় ফের পাশে এসে দাঁড়ান সেই নওশাদ। রফির যে গানে ফেরা উচিত, এ কথা বারবার বলেন তাঁকে।

সহশিল্পীদের রাজনীতি কি তাঁকে বিমুখ করেছিল? নয়তো প্রায় ২৬০০০ ফিল্মি ও নন ফিল্মি গান গাওয়ার পরেও কীভাবে মাত্র ১৬০০০ গান গেয়ে গিনেসবুকে নাম তুলে ফেলেন লতা! ঘটনাটা রফিকে কষ্ট দিয়েছিল।



■ গানের মহড়ায়

সে কারণেই বোধহয় ফিরে আসার পর রফি গেয়েছিলেন 'আজা তুজকো পুকারে মেরে গীত।' গানের ডাকেই বারবার ফিরে গিয়েছেন তিনি। গানকে করেছেন আপন। শরীরকে তুচ্ছ। তাই তো জীবনের শেষ দিনে তিনি শ্যামল মিত্রকে ডেকেছিলেন নিজের বাড়িতে। পুজোর গান রেকর্ড করার আগে তার তালিম নেওয়ার জন্য। তালিম নেন অনেকক্ষণ ধরে। বুকে ব্যথা হলেও তাকে গ্রাহ্য করেননি। সেটাই কাল হল। আর সহ্য করতে পারলেন না রফি। ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। শুধু স্বস্তি একটাই, গানকে আলিঙ্গন করেই বাঁচলেন তিনি।

জীবনে কাউকে কোনও কটু কথা বললেন না, কোনও বিতর্কে জড়ালেন না। শুধু কণ্ঠের মাধুর্য ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি? তাকে কি ভালবেসেছেন রফি? বলা মুশকিল। কারণ নিজের সন্তানদের কাউকেই তো এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে দিলেন না তিনি। সুযোগ পেয়েই দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। গানকে 'নাপাক' তিনি মনে করতেন না ঠিক, কিন্তু সহশিল্পীদের রাজনীতি কি তাঁকে বিমুখ করেছিল? নয়তো প্রায় ২৬০০০ ফিল্মি ও নন ফিল্মি গান গাওয়ার পরেও কীভাবে মাত্র ১৬০০০ গান গেয়ে গিনেসবুকে নাম তুলে ফেলেন লতা! ঘটনাটা রফিকে কষ্ট দিয়েছিল। হয়তো বুঝেছিলেন ওই রাজনীতিটাই 'নাপাক'! তাই সময় থাকতে থাকতে সরে গেলেন? আসলে রফি সারাজীবনই প্রহেলিকা সৃষ্টি করে গেলেন। নিজের কণ্ঠ দিয়ে। আর সেটাই থেকে গেল শেষ পর্যন্ত। শিল্পীর যেটা কাজ, সেটাকেই দিয়ে গেলেন অমরত্ব।



পিতাকে টিভি চালিয়ে দিচ্ছেন ছেলে

পরিবারই ছিল আব্বার কাছে ফার্স্ট প্রয়োরিটি

কাজ শেষ হলেই, কোথাও দু'দণ্ড দাঁড়াতেন না। বাড়ি ফিরে খেলতেন বাচ্চাদের সঙ্গে। বলতেন, সেদিনকার রেকর্ডিংয়ের গল্প। ৫৫ তম ইফির মঞ্চে মহম্মদ রফির জীবনের নানা গল্প শোনালেন শিল্পীর দ্বিতীয় পুত্র **শাহিদ রফি**

রফি সাহাব এবং আমার মা কখনওই চাইতেন না, তাঁর কোনও সন্তান এই মিউজ়িক ইন্ডাস্ট্রিতে আসুক! এই ভাবনার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল, আব্বা সব সময় বলতেন, 'আমার সন্তানরা হয় আমার সমান জনপ্রিয়তা পাবে, নয়তো আমার চেয়েও উঁচু স্থানে থাকবে।' উনি কখনও চাইতেন না, তাঁর কোনও সন্তান তাঁর চেয়ে নিম্নস্থানে থাকুক। বাবা তো বাবা-ই হয়!

আব্বা বেঁচে থাকতে বুঝিনি, উনি কত বড় একজন মানুষ ছিলেন!

আব্বা যখনই বুঝতে পারতেন, আমাদের মধ্যে কেউ এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসার চেষ্টা করছি বা তাঁর মতো গান নিয়ে আগ্রহী, তখনই তিনি তাকে লন্ডন পাঠিয়ে দিতেন! বলতেন, 'ওখানেই পড়াশোনা করো। ওখানেই থাকো।' আমাদের অর্ধেক জীবন লন্ডনেই কেটে গিয়েছে।

আব্বা মারা যাওয়ার পর আমি এখানে চলে আসি। কারণ মা একা থাকতেন। বাকি সব ভাইরা লন্ডনে ছিল। পরে যখন মেহফিলে যেতাম, লোকে বলত, "আপনার আব্বা অ-নে-ক বড় মানুষ ছিলেন..." কিন্তু আব্বা বেঁচে থাকতে আমরা কখনও রিয়েলাইজ়ই করিনি যে উনি কত বড় মানুষ ছিলেন বা কত বড় গায়ক ছিলেন! দুনিয়ার কাছে উনি খুবই উচ্চমানের গায়ক হলেও, আমাদের কাছে ছিলেন তো শুধুই আমাদের আব্বা! আব্বা মারা যাওয়ার পর আমরা বুঝতে পেরেছি, আসলে কত বড় একজন শিল্পীর বাড়িতে আমাদের বড় হয়ে ওঠার সৌভাগ্য হয়েছিল। অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করবেন না, পরবর্তীতে আমার ভাইবোনেরা পর্যন্ত বলত, "আরে! আমাদের আব্বা সত্যিই এত বড় মাপের মানুষ ছিলেন!" তবে আজও, বড় গায়ক হিসেবে নয়, আমরা তাঁকে আমাদের 'আব্বা' হিসেবেই সম্মান করি।

'শম্মী তো গানে হাত-পা এদিক-ওদিক ছুঁড়বে শুধু'

রফি সাহাবের সব রেকর্ডিংয়েই আমি থাকতাম। আমি দেখতাম প্রতিটা গানের রেকর্ডিংয়ের আগে, শম্মীজি রফি সাহাবকে বলতেন, গানের শুটিংয়ে উনি কী কী হরকত করবেন। সেই মতো গান গাইতেন উনি। একটা গানের সময় শম্মী আঙ্কেল প্যারিসে ছিলেন, রেকর্ডিংয়ে থাকতে পারেননি। কিন্তু শুটিংয়ে ফিরে তিনি তো অবাক! গান হুবহু তাঁর প্রয়োজন মতোই গাওয়া হয়েছে। উনি সঙ্গে সঙ্গে আব্বাকে ফোন করলেন, 'আরে রফিজি, আমি যেমন চেয়েছিলাম, আপনি তো ঠিক সেরকমই গেয়েছেন গানটা! এটা কী করে করলেন?' আব্বা বলেছিলেন, 'আরে আমি আর কী করলাম? আমি তো জানতাম এই গানটা শম্মীর জন্য। শম্মী তো গানে হাত-পা এদিক-ওদিক ছুঁড়বে শুধু। এটা তো আমি জানিই...'

কোনও ছবিতে গান গাওয়ার প্রস্তাব পেলে, আব্বা সবার আগে জানতে চাইতেন, গানটি কোন অভিনেতার বা নায়কের লিপে ছবিতে থাকবে। যদিও সব প্লেব্যাক সিঙ্গাররা এটাই করেন। কিন্তু উনি যেন আরও ভাল ভাবে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। আলাদা-

আলাদা নায়কের জন্য ওই একজন মানুষই কণ্ঠ দিয়েছেন, এটা কোনওভাবেই মেলানো যেত না রফিজির গাওয়া গানে। নায়কের চাল-চলন পর্যন্ত মিলে যেত ওঁর গান গাওয়ার ধরনের সঙ্গে!

‘জানো, আজ অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে গান গেয়েছি!’

আব্বা যখন বাড়িতে থাকতেন, বাগানে ঘুরতেন আর গুনগুন করতেন। মন খুলে গান কখনও গাইতেন না। কিন্তু যখন কোনও ভাল, এনার্জেটিক গান উনি রেকর্ড করে আসতেন, তখন সব বাচ্চাদের কাছে ডেকে নিতেন। সেই কাছে ডাকার সময়ও এত ধীরে আওয়াজ আসত, আমরা তো অনেক সময় বুঝতেই পারতাম না, আব্বা কী বলছেন! এমনিতে যে-কোনও গানের রেকর্ডিংয়ের পর আব্বা বাড়িতে এসে সবাইকে জানাতেন, তিনি আজ কোন গানটা গেয়েছেন। সঙ্গে থাকত বাজার থেকে আনা লাড্ডু। যে-কোনও মজাদার গান রেকর্ড করার পরই উনি আমাদের কিছু না কিছু খাওয়াতেন। একবার বাড়ি ফিরে আব্বা আমাদের সকলকে ডেকে বললেন, ‘জানো আজ আমি কার সঙ্গে গান গেয়েছি? অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে!’ ওই সময়ে বাবা ছিলেন মিউজ়িক ইন্ডাস্ট্রির সুপারস্টার। কিন্তু বাবা বাড়িতে এসে এমন ভাব দেখাতেন, যেন উনি নিজে খুব সামান্য একজন মানুষ, অমিতাভ বচ্চনের মতো একজন সুপারস্টারের সাক্ষাত পেয়েছেন বলে এক্সাইটেড হয়ে পড়েছেন। আর আমরা অনেক ছোট ছিলাম। তাই আমরাও জিজ্ঞাসা করতাম, ‘আচ্ছা আব্বা, ওঁকে কেমন দেখতে? কতটা লম্বা উনি? কেমন পোশাক পরেছিলেন? কী ঘড়ি পরেছিলেন?’ আশ্চর্যজনকভাবে উনিও আমাদের সঙ্গে ওই বিষয় নিয়ে কথা বলে যেতেন। উনি নিজে কত বড় মাপের মানুষ, এ ব্যাপারে ওঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।



■ শম্মী কপুরের সঙ্গে রফি


■ পরিবারের সকলের সঙ্গে


■ সন্তানদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে

এক দরজা দিয়ে ঢুকে, বেরিয়ে যেতেন অন্য দরজা দিয়ে

আব্বা শুধু জানতেন, কাজ করতে হবে, গান গাইতে হবে। কাজ শেষ হলেই সোজা বাড়ি ফিরে আসতেন। বাড়ি এসে বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতেন, বাচ্চাদের মতোই মিশতেন। কোনও আওয়ার্ড ফাংশানে যেতে হলেও ড্রাইভারকে বলে রাখতেন গাড়ির স্টার্ট বন্ধ না করতে। একটা দরজা দিয়ে ঢুকে, অ্যাওয়ার্ড নিয়ে বেরিয়ে আসতেন অন্য দরজা দিয়ে। তারপর গাড়ি করে সোজা বাড়ি। কোনও পার্টিতেও তেমন যেতেন না। আশেপাশে কী হচ্ছে, সে ব্যাপারে ওঁর বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না। জানার আগ্রহও ছিল না। কারও বিয়েতে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেও, এক দরজা দিয়ে ঢুকে দেখা করে, শুভেচ্ছা জানিয়ে, আবার অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে পড়তেন। পরিবার ছিল ওঁর কাছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি। তাই আমার কাছে উনি ‘আ গ্রেট ফাদার’। আজও খুব মিস করি সেই দিনগুলো। যদি টাইম মেশিনে চড়ে ফিরে যেতে পারতাম, তাহলে আব্বার পায়ের তলায় বসে আরও অনেক কিছু শিখে নিতে পারতাম!

অনুলিখন: কৌশিক পাল



রফিজি আমার কাছে ভগবানের দূত

অনেকটা একলব্যের মতো করেই রফিজির কাছ থেকে গানের শিক্ষা নিয়েছেন তিনি, **সোনু নিগম**। নিজের ‘ভগবান’ সম্পর্কে তিনি তুলে ধরলেন আবেগের কথা

রফিজি আমার কাছে ভগবানের মতো। যেমন কেউ সাঁই বাবাকে মানেন বা কোনও কাজের আগে কোনও বিশেষ ভগবানকে স্মরণ করেন, আমার কাছে সেরকম স্থানে ছিলেন ‘মহম্মদ রফি বাবা’। আমি তাঁকে সেভাবেই ভালবেসেছি। ১৯৯১ সালে আমি যখন মুম্বইয়ে এসেছিলাম, আমার কেরিয়ারের একেবারে শুরুর দিকে, আমার বাবা-মা এমনভাবে আমার সঙ্গে রফিজির আলাপ করিয়েছিলেন, যেন উনি কোনও ভগবানের দূত!



রফির সন্তানের সঙ্গে, ইফির মঞ্চে



সোনু নিগম

শুধু গায়ক হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেও। বড়দের কাছে ওঁর সম্পর্কে যত শুনেছি, শুধু এটাই মনে হয়েছে, উনি তো একেবারে আলাদা একটা মানুষ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এই ইন্ডাস্ট্রির আর কাউকে মেলানো যায় না। ওঁর লক্ষ্যও ছিল একেবারে আলাদা।

ভজন বা কাওয়ালি, যখন যা গাইতেন, মনে হত রফিজি সেই ধর্মের মানুষ

যাঁরা আমার গান শুনেছেন তাঁরা জানেন, আমি ওঁর কাছ থেকে কতটা অনুপ্রাণিত হয়েছি, কতটা শিখেছি, নিজের গানের মাধ্যমে কতটা আপন করে তুলেছি তাঁকে। আমাদের কেরিয়ারের শুরুর সময় অবশ্যই অনেক সুযোগ সুবিধে ছিল। প্রথমে রেকর্ড, তারপর ক্যাসেট, পরবর্তীতে সিডি... এখন ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মও রয়েছে। সেখানে আমরা ওই সব মায়েস্ত্রোদের গাওয়া গান বারবার শোনার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু ওঁদের শুরুর সময় তো প্রায় কিছুই ছিল না! কিন্তু উনি শিখিয়েছেন, কী করে 'ফুল'-কে 'ফুল'-এর মতো করে উচ্চারণ করতে হবে, কিংবা 'জোশ'-কে 'জোশ'-এর মতো উচ্চারণ করতে হবে। দেশকে নিয়ে গান গাওয়ার সময় দেশের কথা মনে করতে হবে আর ভালবাসার গান গাওয়ার সময় ভালবাসার মানুষের কথা মনে করতে হবে। গজ়ল গাইলে তার মতো পরিবেশ, আর ভজন গাওয়ার সময় যেন মনে হয়, কোনও হিন্দু পন্ডিত বসে গান গাইছেন! আবার যখন কাওয়ালি গাইছেন, তখন যেন মনে হয়, কোনও মুসলিম মানুষ তাঁর আল্লার জন্যই গাইছেন। উনি ভিতর থেকে এতটা স্বচ্ছ ছিলেন, যে-কোনও গান গাইলেই মনে হত, গানটাই যেন 'গায়ক' হয়ে উঠেছে। রফিজির আগে অবশ্যই অনেক ভাল গায়ক ছিলেন। সায়গল সাহেবকে তো আমি বলতাম, 'দ্য গ্র্যান্ড ফাদার অফ প্লেব্যাক সিঙ্গার্স'। ওঁর অনুপ্রেরণায় সবাই কিছু না কিছু

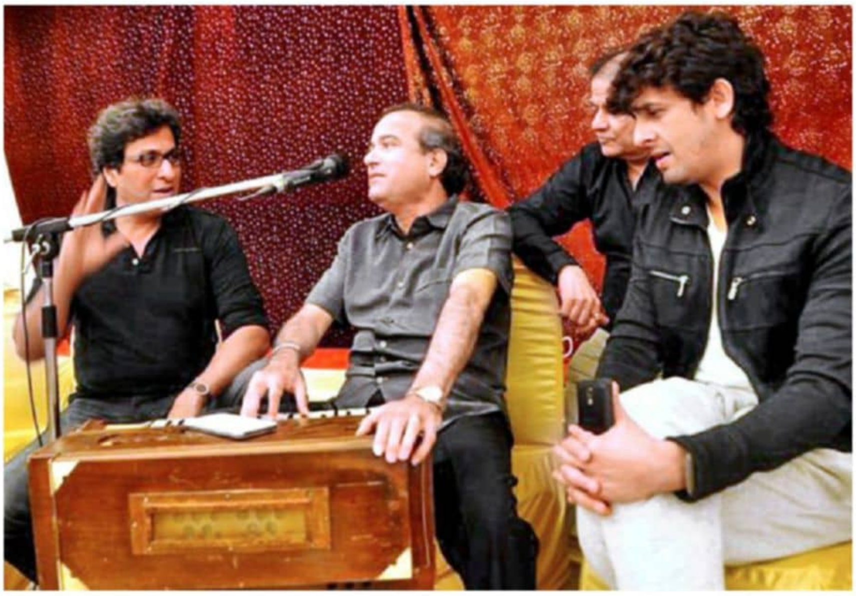
শিখেছে। সেখান থেকে কিশোরকুমার, মুকেশজি, রফিজি সবাই নিজেরা নিজেদের মতো করে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। কিন্তু রফিজির গানের অর্থ ছিল একেবারে আলাদা। গানের ভাষা না জানলেও রফিজির গানের সুর শুনে বলে দেওয়া যেত কোন গানটা দুঃখের, আর কোনটা আনন্দের। কোন গানটা বিশেষভাবে কোনও মেয়ের কথা ভেবে গাওয়া কিংবা কোন গানে কারও প্রশংসা করা হয়েছে। কোনও গানে হয়তো মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, বাবার গলা কাঁপছে আবেগে। গানের শব্দ না জানলেও, রফিজির সুর বলে দিত, আসলে গানের মাধ্যমে উনি কী বোঝাতে চাইছেন।



সুভাষ ঘাই মনে করে রফির পরে তাঁর ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন সোনু

আবেগের বহিঃপ্রকাশ করতেন শুধুমাত্র মাইক্রোফোনের সামনেই

সিনেমার জন্য গান রেকর্ডিংয়ের সময় আমাদের যখন নির্দেশ দেওয়া হত 'এই জায়গাটা ওরকম করো', 'ওই লাইনে শাহরুখ খান কেমন অভিনয় করবেন, দেখে নাও,' 'এই লাইনে বিশেষ এনার্জি দিতে হবে'... এই সব আমরা অনায়াসে করতে পারতাম কারণ আমাদের গুরু ছিলেন মহম্মদ রফি। গান রেকর্ডিংয়ের সময় আমাকে বলা হত, "আচ্ছা যদি রফি সাহাব এখন এখানে থাকতেন, উনি কী করতেন?" তাই গুরু যা করেন, শিষ্য তো সেটাই অনুকরণ করবে। রফি সাহাব নিজেই একটা ইউনিভার্সিটি ছিলেন। ওঁর সংস্পর্শে থেকে প্রতিবার নতুন কিছু শিখেছি। কীভাবে একজন মানুষের কণ্ঠের সঙ্গে সব নায়কদের কণ্ঠ মিলে যেতে পারে, তা আমি বুঝতেই পারি না। দুঃখের গান থেকে শুরু কারে


একটি গানের মহড়ায় সুরেশ ওয়াডকর ও সোনু


রফি, লতা ও মদনমোহন

প্রেমের গান, কাওয়ালি, ভজন, দেশের গান, দশের গান... সব গেয়েছেন। বাদ রাখেননি কোনও কিছুই। ওঁর মধ্যে সব ধরনের আবেগ ছিল, কিন্তু উনি তাঁর বহিঃপ্রকাশ শুধুমাত্র মাইক্রোফোনের সামনে গানের মাধ্যমে করতেন।

প্রথম বার রফি সাহাবের ছেলেকে (শাহিদ রফি) দেখে আমি তো চমকে গিয়েছিলাম! মনে হয়েছিল, ওঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ কাউকে দেখছি। ওই একই চেহারা, একই রক্ত শরীরে বইছে... সত্যিই মনে হয়েছিল ছুঁয়ে দেখি! পরোক্ষভাবে আমার ভগবানকেই তো ছোঁয়া হয়! আশা করি বুঝতে পারছেন, রফিজির জন্য আমি কতটা পাগল!



লতা মঙ্গেশকর ও মহম্মদ রফি

বিতর্কে রফি

রফির বিতর্কহীন জীবনে একটিই খোঁচা এসেছে বারবার, লতা মঙ্গেশকরের রূপ ধরে।

মহম্মদ রফির জীবনযাপন সত্যিই সুফির মতো ছিল। জীবনে বিতর্ক তেমন নেই বললেই চলে। প্রথম জীবনে বিতর্ক বলতে প্রথমা স্ত্রী বশিরা বিবি ও তাঁর ছেলেকে পাকিস্তানে রেখে চলে আসা। আসলে দেশভাগের দাঙ্গায় বশিরার মা-বাবা খুন হয়েছিলেন। ফলে সেই আতঙ্ক থেকেই স্বাভাবিকভাবেই তিনি ভারতের বাসিন্দা হতে চাননি। কিন্তু রফি বম্বেতে নিজের প্লেব্যাকের কেরিয়ারের পরিবর্তে স্ত্রী ও সন্তানকেই ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এমনিতে ধর্মপ্রাণ, ঈষৎ গোঁড়া রফি এই কারণেই হজ করতে যেতেন কিনা, তাকে প্রায়শ্চিত্তসম ভাবতেন কিনা, জানা নেই। তবে রফির সুফিসম জীবনে এক ব্যক্তিই দু'বার বিতর্ক নিয়ে এসেছেন। তিনি লতা মঙ্গেশকর। লতা গায়কদের রয়্যালটির দাবি করেছিলেন। যে পাঁচ শতাংশ রয়্যালটি প্রযোজক পান, তার অর্ধেকের উপর গায়ক-গায়িকার দাবিও থাকা উচিত বলে মনে করেছিলেন তিনি। কিন্তু প্রকাশ্য মিটিংয়ে লতার দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন রফি। তাঁর মত ছিল, প্রযোজক গায়কের যে পারিশ্রমিক দেন, তাতেই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এই বিষয়ে তর্কাতর্কি এমন পর্যায়ে ওঠে যে লতা সঙ্গীত পরিচালকদের জানিয়ে দেন, রফির সঙ্গে ডুয়েট তিনি আর গাইবেন না। '৬৩ থেকে '৬৭ অবধি তাঁদের একসঙ্গে কোনও গান নেই। কম্পোজ়াররা লতার বিকল্প হিসেবে সুমন কল্যাণপুরের কথা ভাবেন। তবে দুই কিংবদন্তিকে একসঙ্গে নিয়ে আসার দায়িত্ব নেন শঙ্কর-জয়কিষণ জুটি। দীর্ঘদিনের বিবাদের মীমাংসা হয় তাঁদের মধ্যস্থতায়। দ্বিতীয়বার, গিনেস বুক অফ ওয়র্ল্ড রেকর্ডস যখন সর্বাধিক রেকর্ডেড গানের হিসেবে লতার নাম বইতে তোলেন (২৫,০০০ গান), তখনও তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেন রফি। এই মর্মে যে, এই নম্বর ভুয়ো এবং রফির রেকর্ডেড গানের সংখ্যাই সর্বাধিক। সেই মামলায় হেরে যান রফি। ফলে লতা নামক কাঁটা বিতর্ক হয়ে বারবার তাড়া করেছে রফিকে।



■ রফি ও কিশোর কি বন্ধু ছিলেন?

গানে মিলায় হৃদয়, তর্কে বহুদূর

সচিন না সৌরভ? ইস্ট বেঙ্গল না মোহনবাগান? প্লেব্যাকের ক্ষেত্রে এমনই দুই শিবিরে বিভক্ত **মহম্মদ রফি** এবং **কিশোরকুমারের** ভক্তরা। কিন্তু কেন এই তুলনা? আলোচনায় **অংশুমিত্রা দত্ত**

‘তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে’... রামনিধি গুপ্ত রচিত এই গানটি একটি চিরবিতর্কিত বিষয়ের উত্তর হতে পারে। মহম্মদ রফি বনাম কিশোরকুমার। এই ‘বনাম’ সংযোগে তাঁদের অবদান যত, তার চেয়ে ঢের বেশি তাঁদের ভক্তদের। বা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের শিল্পীদের লড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতার। কারণ দুই ‘সেরা’র পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী হওয়ার গল্পটা চিরকালীন। যে দুই কণ্ঠশিল্পীর গান আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী, তাঁদের ক্ষেত্রেই বা ব্যতিক্রম হবে কেন!

মোটামুটি একই সময়কালে মহম্মদ রফি এবং কিশোরকুমার বম্বে শহরে আসেন। লাহোর থেকে রফি যখন বম্বে আসেন (১৯৪৪), তার আগে পঞ্জাবি ছবি ‘গুল বালোচ’-এ একটি গান গেয়ে ফেলেছেন তিনি। ওদিকে কিশোরের দাদা অশোককুমার তখন হিন্দি ছবির তারকা। দাদার সুবাদে বম্বে টকিজ় স্টুডিয়োতে নেহাতই ঘুরে বেড়াতেন তিনি। মজারু, মিশুকে বাচ্চা ছেলেটিকে সকলেই খুব পছন্দ করতেন বলে কখনও সিনেমায় কোনও ছোট রোলে ডেকে নিতেন, কখনও সেটের কাজ করতে, কখনও গানের ব্যাকআপ কোরাসে গাইতে। ছোটবেলা থেকে হিন্দুস্তানী ক্লাসিক্যাস সঙ্গীতে তালিমপ্রাপ্ত রফির ক্ষেত্রে পাখির চোখ ছিল সঙ্গীত। ছোটবেলায় আব্দুল ওয়াহিদ খান, জীবনলাল মাট্টু এবং ফিরোজ় নিজ়ামির কাছে গানের তালিম না হলে কেউ এমনি-এমনি নেয় না। কিশোর তখনও জানেন না জীবনে কী করতে চান। নওশাদের সুরেই রফির প্রথম হিন্দি গান গাওয়া। ‘হিন্দুস্তান কে হ্যায়ঁ হম’, ছবির নাম ‘পেহলে আপ’, সাল ১৯৪৪। রফির কেরিয়ারের একদম শুরুর দিকেই নওশাদের কম্পোজ়িশনে ‘বৈজু বাওরা’ ছবিটি আসাও তো আচমকাই। নওশাদ ছবির গানগুলি গাওয়াতে চেয়েছিলেন প্রিয় গায়ক তলত মেহমুদকে দিয়ে। কিন্তু একদিন তাঁকে চুরুট খেতে দেখে নওশাদ ঠিক করেন, বৈজুর মতো সাধকের কণ্ঠ হওয়ার জন্য তলত তেমন নিয়মনিষ্ঠ নন। অতএব ডাক পড়ল মহম্মদ রফির এবং সেই সুযোগের যোগ্য সম্মান দিয়েছিলেন তরুণ রফি। কিশোর সেই সময় বম্বেতে পাকাপাকিভাবে বসবাসও শুরু করেননি। খান্ডওয়া থেকে যাতায়াত করতেন দাদার বাড়িতে। দেব আনন্দের ‘জ়িদ্দি’ (১৯৪৮) ছবিতে খেমচন্দ প্রকাশ তাঁকে প্রথমবার সোলো গান গাওয়ার সুযোগ দেন (‘মরনে কী দুয়ায়েঁ কিউঁ মাঙ্গু’)। কিশোরের কাছে আরও এমন গান গাওয়ার প্রস্তাব গিয়েছিল, কিন্তু তিনি

মনস্থির করতে পারেননি কোন পথে এগোবেন। ১৮৪৯-এ তিনি বম্বেতে পাকাপাকিভাবে আসার সিদ্ধান্ত নেন। দাদা অশোকের খুব ইচ্ছে ছিল ভাই তাঁরই মতো অভিনেতা হবে। ফলে পরপর বেশ কয়েকটি সিনেমায় (১৯৪৬-১৯৫৪) অভিনয় করতে তিনিই কিশোরকে জোর করে পাঠান। মোটামুটি ২২টি ছবিতে অভিনয় করেন কিশোর, যার মধ্যে ১৬টিই ফ্লপ! তবে কয়েকটি ছবি সফল হওয়ায় কিশোরের মনে হয়, অভিনয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ আছে। নিশ্চিত না হলেও কিশোরের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল গানের প্রতি। ফলে তালিমহীন সাবলীল এক গায়ক হিসেবেই তিনি ধীরে-ধীরে নিজেকে গড়তে থাকেন। ওদিক রফি সাহাব ঠিক উল্টো। নিজেকে ঘষে মেজে তিনি তৈরি করেছিলেন, একটিও সুযোগ যাতে হাতছাড়া



কল্যাণজির নির্দেশনায় গান রেকর্ড করছেন মান্না দে, রফি ও কিশোর



রফি যখন হজ করে ফেরেন, কিশোর তখন স্টার



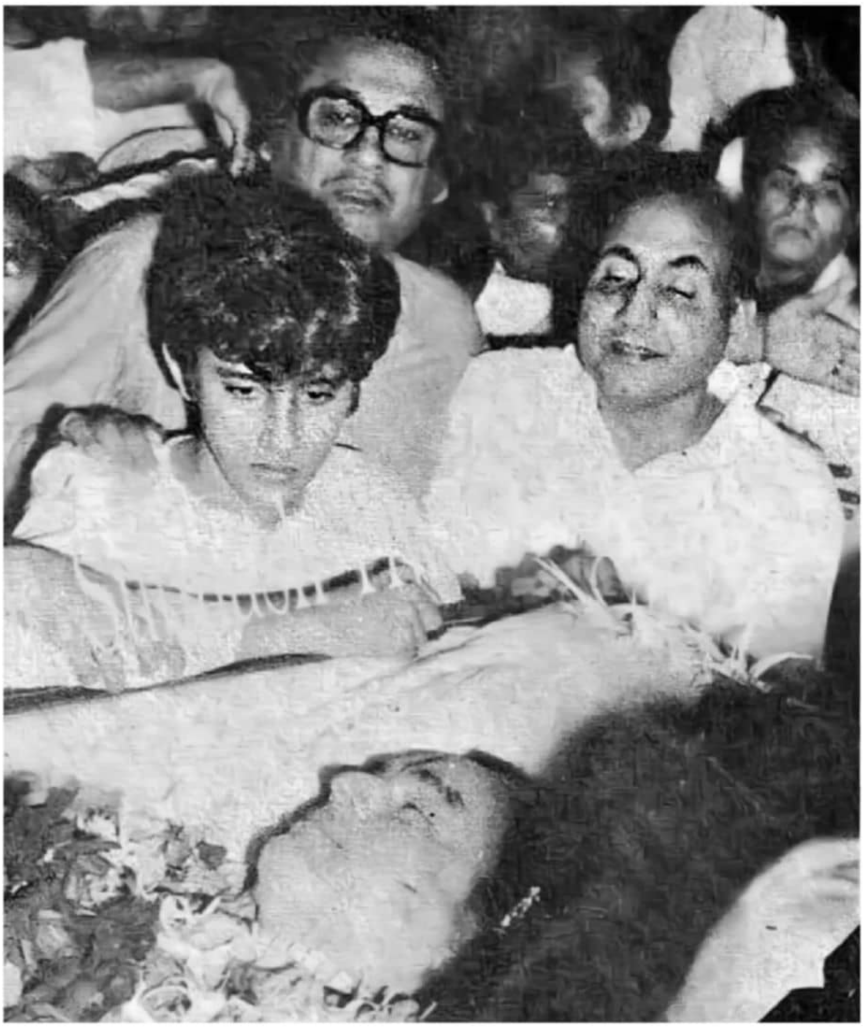
রিহার্সালে রফি ও কিশোর

নওশাদ গানগুলি গাওয়াতে চেয়েছিলেন তলত মেহমুদকে দিয়ে। কিন্তু একদিন তাঁকে চুরুট খেতে দেখে নওশাদ ঠিক করেন, গাইবেন রফি

না হয়। রফি এবং কিশোর, দু'জনের কেরিয়ারেই গায়ক কে এল সায়গলের একটা যোগ রয়েছে। ১৩ বছর বয়সি রফি লাহোরে প্রথম স্টেজে গান গেয়েছিলেন, কারণ একটি অনুষ্ঠানে সায়গল যেতে পারেননি। আর কিশোর যে সায়গলের গান শুনে তাঁর স্টাইল অনুকরণ করতেন, এ তো অনেক পাঠকই জানেন। কিশোর যখন নিজের গানের পথ খুঁজেছিলেন, সেই সময় থেকেই মহম্মদ রফির সঙ্গে ডুয়েট গান গেয়েছেন, যার একটিও তেমন জনপ্রিয় হয়নি। যেমন 'দুনিয়া মেঁ অমীরোঁ কো' (কনীজ, ১৯৪৯), 'অজী তুম কহো জী', (মালকিন, ১৯৫৩), 'নাচে মোরা অঙ্গনা' (মস্তানা, ১৯৫৪), 'হে বাবু ইয়ে হ্যায় জ়মানা তেরা' (ভাগম ভাগ, ১৯৫৬) ইত্যাদি। রফি তখন হিন্দি প্লেব্যাকের বেতাজ বাদশাহ। নিজেদের সেরা কম্পোজ়িশনগুলো (বিশেষত দিলীপকুমার, শম্মী কপূরদের কণ্ঠস্বর হিসেবে) সঙ্গীতকাররা তুলে রাখতেন মহম্মদ রফির জন্যই।

মন মেরে' ('ফান্টুশ', ১৯৫৬)... এসব গান কিশোরকে পরিচিতি দেয়। তবে ও পি নাইয়ার, সলিল চৌধুরী, হেমন্তকুমারের মতো কম্পোজ়াররা কিশোরকে দিয়ে একটি এক্সপেরিমেন্টাল, দ্রুত লয়ের, নাটকীয় গান গাওয়ালেও, সেরা গানটি তুলে রাখতেন রফির জন্যই। 'গাইড' সিনেমার কথাই ধরুন। ছবির সবচেয়ে হিট গান 'গাতা রহে মেরা দিল' কিশোরকে দিয়ে গাওয়ালেও 'কেয়া সে কেয়া হো গয়া' বা 'দিন ঢল জায়ে'র মতো ভাবাবেগের গান কিন্তু শচীন কর্তা রফিকে দিয়েই গাইয়েছিলেন। কিন্তু রফি সাহাব দেব আনন্দের জন্য এত অপূর্ব সব গান গাইলেও, পাঁচের দশকের শেষ থেকে দেবের কণ্ঠ হিসেবে কিশোর অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। 'পেইং গেস্ট'-এর 'মানা জনাব নে পুকারা নহী', 'ছোড় দো আঁচল'; 'তিন দেবীয়াঁ'-র 'খোয়াব হো তুম', 'জুয়েল থিফ'-এর 'ইয়ে

আসলে কিশোর গানের তালিম নেননি বলে, প্রথমদিকে অনেক সঙ্গীত পরিচালকই তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেননি। তাঁর মধ্যে অন্যতম সলিল চৌধুরী



মুকেশের অন্তিমযাত্রায় দুই সহকর্মী কিশোর ও রফি

আসলে কিশোর গানের তালিম নেননি বলে, প্রথমদিকে অনেক সঙ্গীত পরিচালক তাঁকে গ্রহণ করেননি। যেমন সলিল চৌধুরী। প্রথমদিকে মজার গান 'মুন্না বড়া পেয়ারা'র মতো মজার গান শুধু কিশোরকে দিয়ে গাওয়ানো সলিলও পরে 'কোই হোতা জিসকো অপনা' গানটির মতো কঠিন গান তাঁকে দিয়ে গাইয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে কিশোরের গায়কিতে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল, সে কথা কিশোর নিজেও স্বীকার করেছেন। ফলে এমন কোনও গান, যেখানে ক্লাসিক্যাল গায়কির প্রয়োজন, তাঁর কাছে এলে তিনি নিজেই পাঠিয়ে দিতেন রফি সাহেবের কাছে। অর্জুনদের আসলে সারথী প্রয়োজন। সারথী কৃষ্ণ, যার চক্রের ঘূর্ণনে বদলে যাবে যুদ্ধের গতি। মহম্মদ রফির সাফল্যের সারথী নওশাদ এবং শঙ্কর-জয়কিষণ জুটি। তা হলে কিশোরকুমারের ক্ষেত্রে তা নিঃসন্দেহে বর্মণ পিতা-পুত্র। সকলের প্রিয় যখন রফি, তখন শচীন কর্তা দেব আনন্দের কণ্ঠে পরপর গান



কলকাতায় কনসার্টের বিজ্ঞাপন। এক মঞ্চে মহম্মদ রফি, কিশোর কুমার, আশা ভোঁসলে ও আর ডি বর্মণ

গাওয়ান কিশোরকে দিয়ে। সেই গান দেব আনন্দকে একটি নতুন স্টারডম দেয়। 'জীবন কে সফর মেঁ রাহী' ('মুনিমজী', ১৯৫৫), 'দুখী দিল না হোতা বেচারা', 'আসমাঁ কে নীচে'; 'প্রেম পূজারী'র 'শোখিয়োঁ মেঁ', 'ফুলোঁ কে রং

সে’... তবে কিশোরের আসল উত্থানের নেপথ্যে রয়েছে রাজেশ খন্নার উত্থানও। ’৬৯-এ ‘আরাধনা’র জন্য ‘গুনগুনা রহে হ্যায়’ বা ‘বাগোঁ মেঁ বাহার’ গান দু’টি গেয়ে মহম্মদ রফি ধার্মিক অবসর নিয়েছিলেন, হজ করতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বোঝেন, রাজেশ খন্নার মতো কিশোরও হয়ে গিয়েছেন একটি নক্ষত্র। ‘মেরে সপনোঁ কী রানি’, ‘কোরা কাগজ় থা’, ‘রূপ তেরা মস্তানা’র মতো গানে নিজের বলিষ্ঠ এবং নাটকীয় কণ্ঠ দিয়ে রাজেশ এবং নিজের ভাগ্য লিখে ফেলেছেন কিশোর। পাঁচ এবং ছয়ের দশকে যে ধরনের নায়কের ইমেজ ছিল, ছয়ের শেষ থেকে তা পাল্টাতে শুরু করে। রাজেশ খন্নার পর আসেন অ্যাংরি ইয়ং ম্যান অমিতাভ। তাঁর কণ্ঠেও অপরিহার্য হয়ে ওঠেন কিশোর। রাজেশ এবং অমিতাভ দু’জনের জন্যই অনেক ভাল গান গেয়েছেন মহম্মদ রফি। কিন্তু কিশোরের কণ্ঠে যে সোজাসাপটা পৌরুষ ছিল, তা যেন সাতের দশকের ক্রুদ্ধ, অভিমানী নায়কের ইমেজের



লক্ষ্মীকান্ত-পেয়ারেলাল, রফি, মুকেশ, লতা, কিশোর, মনমোহন দেসাই ও অন্যান্যরা



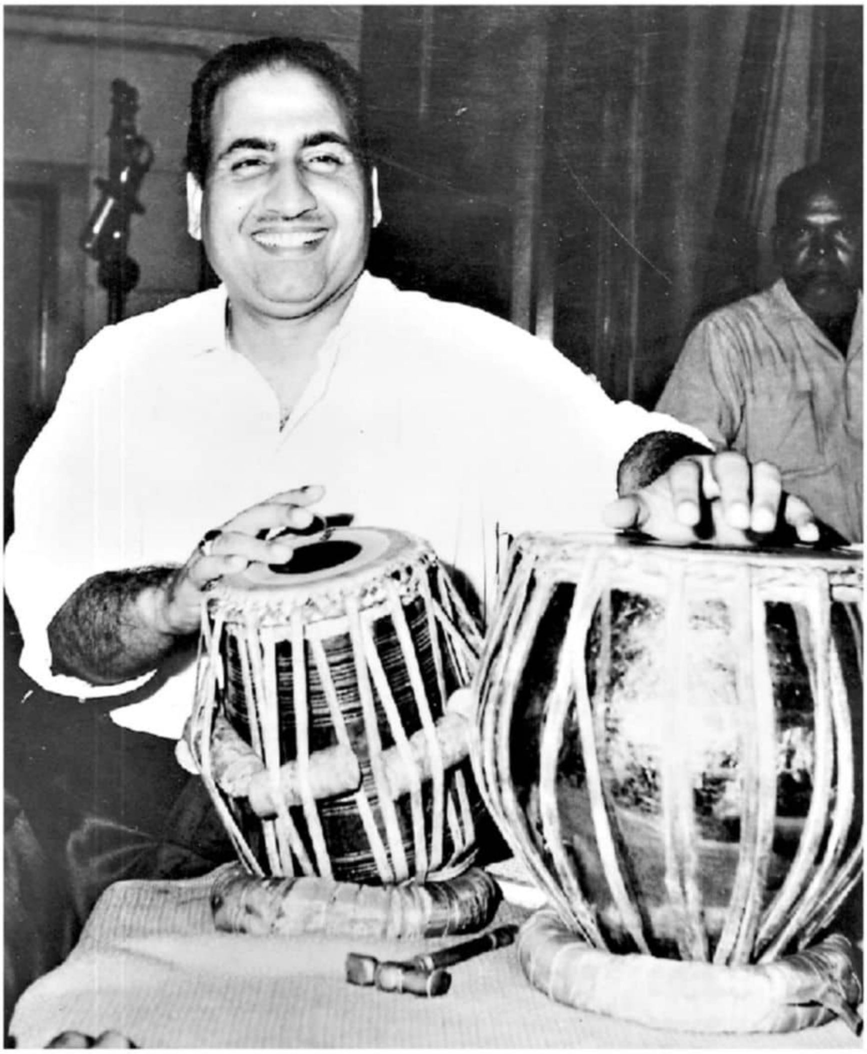
দুই মহারথী, মহম্মদ রফি ও কিশোরকুমারের সঙ্গে বাপি লাহিড়ী। একটি অনুষ্ঠানের মাঝে

সঙ্গে খাপে খাপ মিলে গেল। সেই সঙ্গে রাহুল দেব বর্মণের উত্থান... রাজত্ব যে সমাপতনের মতোই। সেই সময় মুকেশ, মান্না দে এবং মহম্মদ রফি সকলের সঙ্গেই কিশোর ডুয়েট গেয়েছেন। ধরুন, ‘তুম বিন জাউঁ কহাঁ’ গানটির কথা। মহম্মদ রফি অপূর্ব মায়াময়, গানের ব্যকরণে ‘পারফেক্ট’ গেয়েছেন গানটি। কিন্তু শ্রোতা মনে করবেন কিশোরের সিগনেচার ইয়োডলিং দিয়ে গানের শুরুটি... ঠিক যেমন হয়েছিল ‘জানু মেরি জাঁ’ গানের ক্ষেত্রে। বা মান্না দে-র সঙ্গে ‘ইয়ে দোস্তি’। যে যে গানে কিশোর অমিতাভ বা রাজেশের কণ্ঠ হয়েছেন কোনও অনসম্বল কাস্টে (যেমন ‘অমর আকবর অ্যান্টনি’র টাইটেল ট্র্যাক বা ‘হমকো তুমসে হো গয়া হ্যায় পেয়ার’ গানটিতে), সেখানে অন্য কারও কণ্ঠ মনে পড়া একটু অসুবিধে।

কিন্তু দু’জনে ঠিক তুলনীয় নন। যদি তর্ক হয় রফি কেবল ক্লাসিক্যাল আধারের গান বা সূক্ষ্ম কাজ সম্বলিত গান গাইতে পারেন, তা হলে তার উত্তর তিনি দিয়েছেন ‘চাহে কোই মুঝে জংলী কহে’, ‘বদন পে সিতারে’র মতো দ্রুত গতির পাশ্চাত্য রিদমের গান গেয়ে। আবার যদি বলা হয় কিশোর রাগাশ্রয়ী গান গাইতে অক্ষম, তার জবাবও পাওয়া যায় ‘চিঙ্গারি কোই ভড়কে’, ‘ইক চতুরনার’, ‘পগ ঘুংরু বাঁধ’, ‘মেরে ন্যায়না সাওঁন ভাদোঁ’র মতো গানে। এই তর্কে আমরা ভুলে যাই নেপথ্যের কারিগরদের। রফি বম্বে আসার দিন থেকে যদি নৌশাদের স্নেহ না পেতেন, কিশোর যদি শচীন কর্তার প্রিয় গায়ক না হতেন, তা হলে হয়তো এই তর্কও হত না, অন্য খাতে বইত দু’জনের জীবন।

মানুষ হিসেবেও যে দু’জন দুই মেরুর! নিপাট ভালমানুষ, পারিবারিক, নির্বিবাদী রফি একদিকে। অন্যদিকে কিশোর, যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিবাদে যেতেও পিছপা হননি! শোনা যায়, কিশোরের গানে যে ব্যান বসানো হয়েছিল, ইন্দিরা গান্ধীকে সেই ব্যান তোলার অনুরোধ করেছিলেন স্বয়ং মহম্মদ রফি। অন্যদিকে কিশোর বারবার বলে গিয়েছেন গায়ক হিসেবে রফি সাহেবের শ্রেষ্ঠত্বের কথা।

ও হ্যাঁ, গানের জগতেও যেমন তিন-চার বছরের ব্যবধানে এসেছিলেন দু’জন, ইহজগতের ত্যাগের বয়সও দু’জনের তেমনই। রফি ৫৫ বছর বয়সে ও কিশোর ৫৮ বছর বয়সে... কারণটাও এক, হার্ট অ্যাটাক।



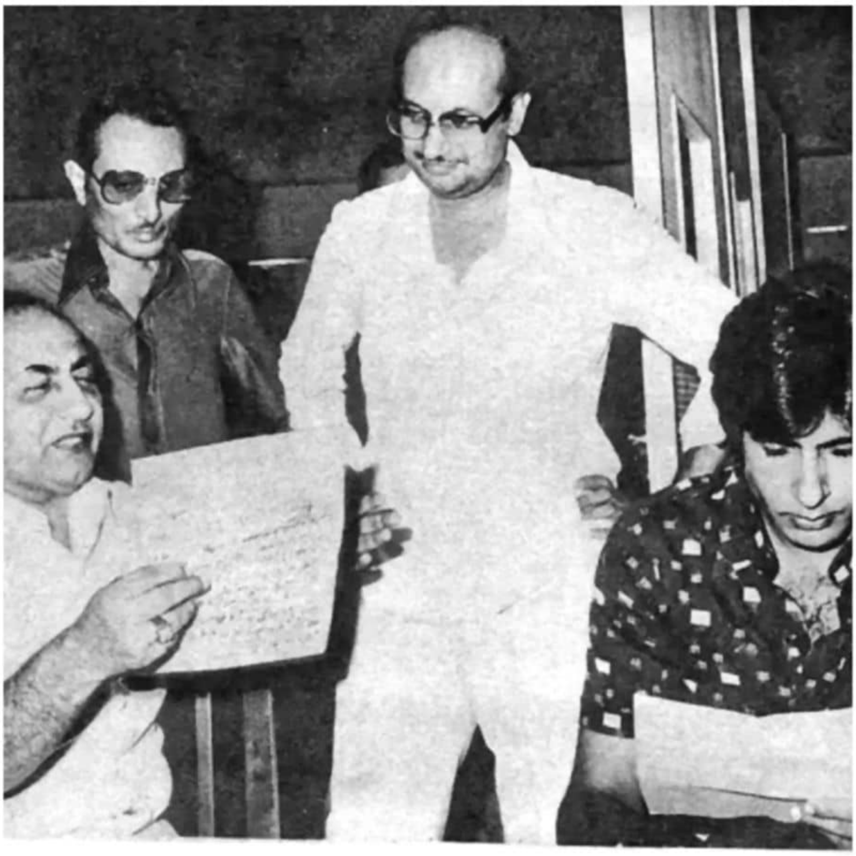
‘বড়ি দের ভাই, কব লোগে খবর মোরে রাম...’ যখন স্কুলে পড়তাম রফিজির এই গানটা গেয়ে অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছিলাম। এখন অনেক বেসুরে গান গাই, বেসুরো হয়ে গিয়েছি। কিন্তু রফিজির সঙ্গে আমার জীবন-যৌবন-সাফল্য সব কীভাবে জড়িয়ে রয়েছে সেটাই বলতে চাই। ছোট থেকেই সিনেমার গানের প্রতি আমার বিশেষ নজর ছিল। বড় হওয়ার পাশাপাশি লতাজি, মুকেশজি, রফিজি সকলেরই গান শুনেছি। ভাগ্যের জেরে ইন্ডাস্ট্রিতে আসি এবং রফিজির সঙ্গে আলাপও হয়ে যায়। এফটিআই-এ পড়ার পর ‘কালীচরণ’, ‘বিশ্বনাথ’, ‘কর্জ়’, ‘বিধাতা’... আরও অনেক কাজ করেছি। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে আমার আসা আর ওঁর চলে যাওয়া, এই দুটো ছিল এক সুতোয় গাঁথা। কিন্তু আমি খুব খুশি হয়েছিলাম, যখন ‘কার্জ়’ ছবিতে লক্ষ্মীকান্তজির ‘দর্দ-এ-দিল’ গানটি রফিজি গেয়েছিলেন। যেদিন রেকর্ডিং থাকত আমি স্টুডিয়োয় গায়কের আগে পৌঁছে যেতাম। মিউজ়িক কম্পোজ়ারদের সঙ্গে গান নিয়ে কথা চলতেই থাকত। ‘দর্দ-এ-দিল’ গানের রেকর্ডিংয়ের সময় রফিজির সঙ্গে প্রথম দেখা। গজ়ল থেকে গানটা পরিবর্তন করা হল পপ সঙ্গীতে। কারণ ওই ছবিটা একটু অন্য ধাঁচের ছিল। কথায়-কথায় রফিজি আমাকে সে দিন

‘দর্দ-এ-দিল, দর্দ-এ-জিগর’, ব্যাস এইটুকুতেই আমার প্রাণ ভরে গিয়েছিল: সুভাষ ঘাই

রফিজির সঙ্গে রেকর্ডিং থাকলেই আগেভাবে স্টুডিয়োতে গিয়ে বসে থাকতেন তিনি! মহম্মদ রফির স্মৃতিচারণায় পরিচালক **সুভাষ ঘাই**



‘কর্জ়’ ছবির গান রেকোর্ডিংয়ের পর এক ফ্রেমে পরিচালক সুভাষ ঘাই এবং মহম্মদ রফি



■ গান রেকর্ডিংয়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রফি, পাশে ছবির নায়ক অমিতাভ বচ্চন

বললেন, “আপনি খুব ভাল ছবি বানান।” প্রথম সাক্ষাতে ওঁকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, ‘আসমান সে আয়া ফরিস্তা’। এতটাই বিনয়ী, নম্র ছিলেন উনি।
সিঙ্গার আর প্লেব্যাক সিঙ্গারের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। সিঙ্গার মন খুলে গান গায়, নিজের ইচ্ছে মতো গান গায়। যেখানে ইচ্ছে থামতে পারে, যেখানে খুশি দাঁড়াতে পারে। আর একজন প্লেব্যাক সিঙ্গারকে সিনেমার জন্য গান গাইতে হয়। গানের প্রতিটা লাইনকে বুঝতে হয়, উপলব্ধি করতে হয়। গানকে সংলাপের মতো করে পড়তে হয়। পর্দায় দৃশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হয়। সিনেমা দেখার সময় যেন মনে হয়, গানটা ওই নির্দিষ্ট নায়কের জন্যই তৈরি। গান লেখা, রেকর্ড করা, অভিনেতা এবং সিনেমার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পর্দায় তা তুলে ধরা... এই পুরো পদ্ধতিটাই খুব কঠিন। গান তো যে-কেউ গাইতে পারে কিন্তু কীভাবে গাইবে, কীভাবে শব্দ প্রয়োগ করা হবে সেটাই মূল। ‘দর্দ-এ দিল’ গানের প্রথম লাইনটা যখন রফিজি গেয়েছিলেন, তখনই আমি নিশ্চিত ছিলাম, এই গান হিট হবেই।



■ অনুরাধা পড়ওয়ালের সঙ্গে গান রেকর্ডিংয়ের একটি মুহূর্ত

‘দর্দ-এ-দিল, দর্দ-এ-জিগর’, ব্যাস এইটুকুতেই আমার প্রাণ ভরে গিয়েছিল। রফিজি সব সময়ই মাথা নিচু করে নতুন গান শিখতেন। এই প্রতিভা সত্যি দুর্লভ। রফিজি এত ধীর গতিতে, নরম ভাবে, নীচু স্বরে আর ভালবেসে গাইতেন যে প্রথম প্রথম ওঁর সঙ্গে কাজ করার সময় ভাবতাম, রেকর্ডিংয়ের সময় আওয়ার কীভাবে পৌঁছবে! কিন্তু রেকর্ডিংয়ের সময় আমার কাছে সবটা পরিস্কার হল। উনি গান রেকর্ডিংয়ের সময় যেভাবে শব্দ প্রয়োগ করতেন, আসলে সেটাই ছিল রফিজির গানের বিশেষত্ব।
পর্দায় যে গান শোনা যায়, আসলে তার পিছনে অনেক পরিশ্রম থাকে। একজন সঠিক প্লেব্যাক সিঙ্গারকে বেছে নেওয়ার আগে ছবির পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালককে অনেক আলোচনা করতে হয়। আমার একটা কথা এখনও মনে আছে, ‘তাল’ ছবিতে ‘ইস্ক বিনা’ গানটির জন্য সোনু নিগমকে আমি ডেকেছিলাম। ও আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, “এই গানটা কেমন করে গাইব?” আমি শুধু বলেছিলাম অন্তরাটা রফি সাবের মতো গাইতে। শুধু তাই নয়, আমি অনেক গায়ককে বলেছি, শুধু রফি সাবের মতো গাইতে। কোনওভাবে ওঁকে অনুকরণ করতে। ‘বিধাতা’ ছবিতে শম্মী কপূরের লিপে একটা গান ছিল ‘হাতো কি চাঁদ লকিরো কা’। গানটা শুনলেই মনে হত, ওটা যেন শম্মীজিরই গাওয়া। বারবার শুধু মনে হত, শম্মীজির জন্য গান শুধু উনিই গাইতে পারবেন। ‘হার ওয়াতন তেরে লিয়ে’ গানটা তো শুধুমাত্র রফিজির জন্যই ছিল। আর কেউ ওটা গাইতে পারত না।
আমি ওঁর সব রেকর্ডিংয়ে থাকার চেষ্টা করতাম। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, রফিজি প্লেব্যাক শুরু করার আগে সবার প্রথমে জেনে নিতেন, পর্দার সামনে কে থাকবে। শম্মী কপূর, দেবানন্দ, দিলীপকুমার, নাকি অন্য কেউ। যদিও এটা সবাই জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু রফিজির গান শুনে মনে হত, এই গানটা ওই নায়কের জন্যই গাওয়া। ভুল বললাম, মনে হবে ওই নায়কই গানটা গাইছেন, কোনও প্লেব্যাক সিঙ্গার নয়। এটাই রফিজির ম্যাজিক!

ছবিতে রফি

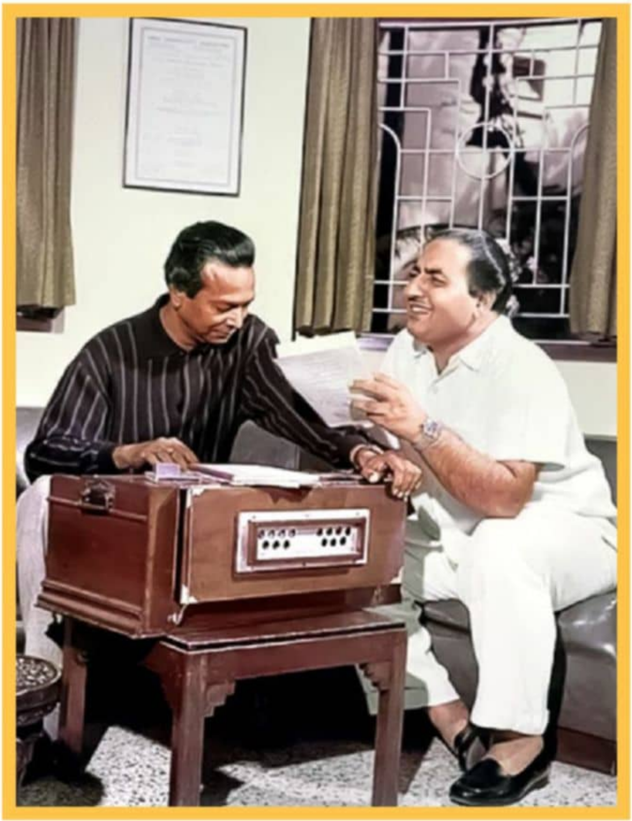
বহু গুণী মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছেন তিনি। সঙ্গ দিয়েওছেন অনেককে। সেই সব মুহূর্ত তৈরি করেছে টুকরো স্মৃতি। রফির জীবন থেকে সেই সব ছবি তুলে এনে তৈরি হল এই প্রতিবেদন



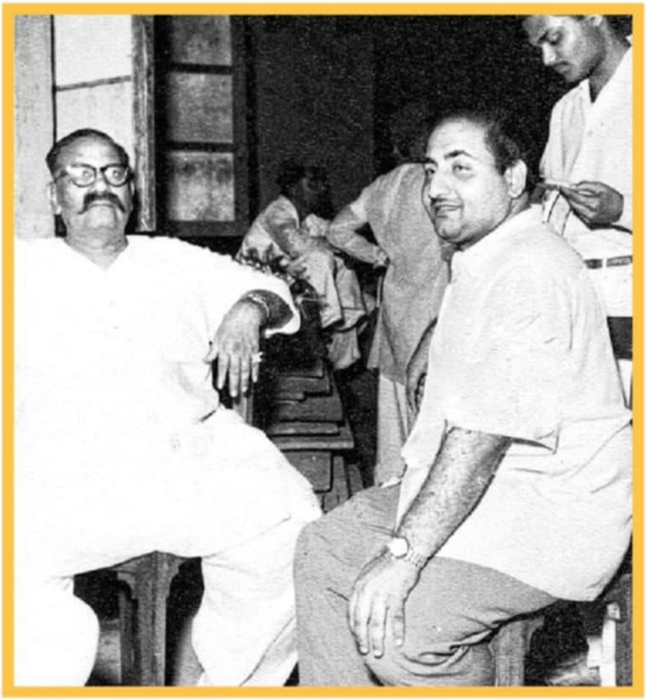
■ সদাহাস্যময়



■ রাহুল দেব বর্মনের সঙ্গে রেকর্ডিংয়ের মাঝে



■ নওশাদ ছিলেন প্রাণের বন্ধু



■ বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেবের সঙ্গে



রাজ কপূরের সঙ্গে কি তাঁর মনোমালিন্য হয়েছিল?



মেজ পুত্রের সঙ্গে রফি

রফিই সম্ভবত দেশের একমাত্র গায়ক, যিনি সাফল্যের শীর্ষে থাকাকালীন নিজের পারিশ্রমিক ছবি অনুযায়ী ঠিক করতেন। কম বাজেটের ছবিতে কম টাকা নিতেন কিংবা বিনা পয়সাতেও গান গেয়ে দিতেন তিনি!



লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানের মাঝে



স্ত্রীর সঙ্গে খুনসুটি



অশোককুমারের সঙ্গে



মহম্মদ আলির সঙ্গে বক্সিং-বক্সিং খেলা



সায়গল সাব আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন

মারা যাওয়ার দু' মাস আগে আনন্দলোক-কে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন মহম্মদ রফি। উঠেছিল নানা বিস্ফোরক প্রসঙ্গ। তারই কিছু অংশ তুলে ধরা হল

তিনি ছিলেন পুরনো আমলের নিয়মানুবর্তিতার মানুষ। নিজে প্রডিউসারদের সঙ্গে কথা বলতেন না। সাংবাদিকদের কদাচিৎ কোনও ইন্টারভিউ দিতেন। সময় দিলে আশা করতেন, সকলে একেবারে নিয়ম মেনে কাজটা করবেন। এহেন মহম্মদ রফি এই সাক্ষাৎকারটি দিয়েছিলেন ১৯৮০ সালে। মারা যাওয়ার ঠিক দু' মাস আগে। আনন্দলোকে প্রকাশিত সেই সাক্ষাৎকারই কিছু অংশ রইল পাঠকদের জন্য।

প্রায় চারযুগ ধরে একটানা সাফল্যের রহস্যটা কি?

১৯৪২ সাল থেকে আমি এ লাইনে আছি। আমার জীবনে নানান ওঠাপড়া গেছে। কিন্তু রেওয়াজ ছাড়া গলা থাকে না। সিগারেট খাই না। মদ ছুঁই না। কোনও দোষ নেই আমার। অথচ চোখের সামনেই কোনও-কোনও নতুন গায়ককে দেখি, একটা গান হিট হলেই মাথা গরম করে ফেলে। হয়তো পরের গান থেকেই ওর পতন ঘটে যায়!

আগেকার ও এখনকার ফিলম মিউজিকে পার্থক্য কোথায়?

আগে মেলোডি ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভিত্তি ভাল না হলে চলত না। এখন তো মিউজিক স্রেফ গোলমালে দাঁড়িয়ে গেছে। আগে গানের কথার ফাঁকে ফাঁকে একটু মিউজিক থাকত। এখন যেন মিউজিকের ফাঁকে ফাঁকেই গানের কথা থাকে।

প্লেব্যাক গায়ক হিসেবে রফির হাতেখড়ি কি করে হল?

কিরানার ওস্তাদ আব্দুল ওয়াহিদা ছিলেন আমার গুরু। লাহোরে আমাদের বাড়ি। ১৫ বছর বয়সে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে গান গাইতাম। একবার সেসময়ের নামী প্রোডিউসার-অভিনেতা নাসির খান আমার গান শুনে বমবে নিয়ে যেতে চাইলেন ফিলমে গান গাওয়াবেন বলে। বাবার অনুমতি চাওয়া হল। কিন্তু হজে যাওয়া গোঁড়া মুসলমান ছিলেন আমার বাবা। গান গেয়ে কেরিয়ার করি, তা ওঁর পছন্দ ছিল না। এদিকে ওস্তাদ আব্দুল ওয়াহিদের কাছে গান শেখা চলছিল। শেষকালে আমার দাদাই বাবাকে বোঝালেন নাসির খানের সঙ্গে বোমবে যাওয়ার ব্যাপারে। নাসির বারেবারেই আমাকে ডাকছিলেন। অপ্রসন্ন চিত্তেই বাবা শেষটায় রাজী হলেন। 'লায়লা মজনু'-তে প্রথম প্লেব্যাক গাইলাম ১৯৪২ সালে। নায়ক-নায়িকা ছিলেন নাসির ও স্বর্ণলতা। প্রয়াত পণ্ডিত বোঁদরাম ছিলেন মিউজিক ডিরেক্টর। আমি কোরাসের সদস্য হিসেবে কাওয়ালী গেয়েছিলাম। তারপর 'গাঁও কি গোরী' ছবিতে ডুয়েট গাইলাম নূরজাহানের সঙ্গে।



■ লাইভ শোয়ের মাঝে

মিউজিক ডিরেক্টর শ্যামসুন্দর। 'গুল বানোজ'-এ ডুয়েট গাইলাম জীনাত বেগমের সঙ্গে। তখন কার দিনে গান গেয়ে পঁচাত্তর টাকা পেতাম। ঐসময়কার নামী গায়ক ছিলেন সায়গল সাব, জি এম দুরাণী ও খান মস্তান। কিন্তু ওঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেননি আমাকে। উল্টে উৎসাহ দিয়েছেন। লাহোরে একবার সায়গল গান গাইতে এসেছিলেন। শেষ মুহূর্তে মাইকটা খারাপ হয়ে গেল। মাইক ঠিক করতে করতে সময় কাটানোর জন্য আমাকে গান গাইতে বলা হল। তখন আমার বয়স মোটে পনেরো বছর। নাসির খানের সঙ্গে দেখাও হয়নি। গান শুনে সায়গল সাব আমাকে আশীর্বাদ করলেন, বললেন, 'একদিন তোমার গায়ক হিসেবে নাম-ডাক হবে।' এরপর ১৯ বছর বয়সে 'শাহজাহান' ছবিতে সায়গল সাবের সঙ্গে একটা গান গেয়েছিলাম। ৩৭ বছর হয়ে গেছে- তবু মনে পড়ে গান রেকর্ড করার আগে কীরকম নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম।

সবাই পয়সার ধান্দায় আছে। হয় বিদেশী সুর, নয়তো অন্য সুরকারের সুর চুরি করেই কাজ চলছে। আমি মিউজ়িক ডিরেক্টর হলে অন্যদের ভয় হবে, আমি তাঁদের সুর চুরি করব। ওঁরা আমাকে আর গাইতে ডাকবেন না



■ সুরের সাধক



■ বক্তা মহম্মদ রফি

আজকাল যে মিউজ়িক ডিরেক্টররা একসঙ্গে ডজন-ডজন ছবি হাতে নেন...

খুব খারাপ লাগে। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল 'সরগম'-এ যেরকম সুর দিয়েছেন, তেমন আর ক'জন পারেন? সবাই পয়সার ধান্দায় আছে। হয় বিদেশী সুর, নয়তো অন্য সুরকারের সুর চুরি করেই কাজ চলছে।

আপনি সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালকের কাজ করলেন না কেন?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষ কেবল একটি ক্ষেত্রেই নিখুঁত হতে পারে। তালাত মামুদের কী হল? অভিনয় শুরু করেও অভিনেতা হতে পারলেন না। গানও আর গাওয়া হল না। প্রয়াত মুকেশভাই প্রোডাকশনে গিয়ে ভীষণ মার খেলেন ছবি ফ্লপ করে। আমি আজ মিউজ়িক ডিরেক্টর হলে অন্যদের ভয় হবে, আমি তাঁদের সুর চুরি করব। ওঁরা আমাকে আর গাইতে ডাকবেন না হয়তো।

রাজেশ খান্না-কিশোর কুমারের যুগে রফির জনপ্রিয়তায় কি একটু ভাঁটা পড়েছে?

মাঝখানে কিছু কম গান গেয়েছি। কিন্তু জনপ্রিয়তার ব্যাপারটা আমি ভাবি না। কেননা দিলীপকুমার, রাজেন্দ্রকুমার ও শাম্মীর ঠোঁটে আমার গান শোনার পর মানুষের হয়তো রাজেশের লিপে আমার গান ভাল লাগত না।

অনেকেই বলেন আপনি টাকাপয়সার ব্যাপারে কাবুলীওয়ালার মতো নন। ওটা নিয়ে নাকি চিন্তাই করেন না।

প্রডিউসার যা দিতে পারেন, সেই পারিশ্রমিক আমি নিশ্চয়ই চাইব। কিন্তু কেবল টাকার কথা ভেবে আমি গান গাই না। যা রোজগার করি, তার একটা বড় অংশই দান করে দিই। তা নিয়ে ঢাক বাজানোর স্বভাবও আমার নেই। আল্লা ভালা করেগা উসকা জো অউরোকা করেগা ভালা।

প্রতিবেদক: জ্যোতি (বানান অপরিবর্তিত)
প্রকাশকাল: ১০ মে ১৯৮০



■ কিয়ারা আডবাণী

কোথায় কিয়ারা?

প্রিমিয়ার থেকে প্রচার, সব জায়গায় অধরা কিয়ারা। 'গেম চেঞ্জার' ছবির মুক্তির ঠিক আগের মুহূর্তগুলোতে দেখা মিলছে না তাঁর। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন কিয়ারা আডবাণী এবং রাম চরণ। ছবির গানে ইতিমধ্যেই মন ভরেছে দর্শকদের। কিন্তু সেই ছবির প্রচার কাজ প্রায় একা হাতে সামলাচ্ছেন রাম চরণ। ছবির ট্রেলর লঞ্চে দেখা যায়নি কিয়ারকে। মুম্বইয়ের প্রিমিয়ারেও কিয়ারা নেই! খোঁজ নিতেই জানা যায়, হাতে একের পর এক কাজ তাঁর। চলছে একটানা শুটিংও। তাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কিয়ারা। আপাতত বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই বাড়িতে রয়েছেন। আগামী দিনে কিয়ারার হাতে রয়েছে একগুচ্ছ কাজ। যার মধ্যে অন্যতম 'ওয়ার টু'। তার আগে দক্ষিণী নায়কের হাত ধরে কতটা গেম চেঞ্জ করতে পারেন তিনি, সেটার দেখার অপেক্ষা।

অভিনয়ে গোবিন্দ-পুত্র

অভিনয় জগতে পা রাখতে চলেছেন গোবিন্দ-পুত্র যশবর্ধন আহুজা। সোশ্যাল মিডিয়ার প্রায় অধরা তিনি। তবে বাবা-মায়ের হাত ধরে ছোট থেকেই খানিক লাইমলাইটে থাকতে অভ্যস্ত যশবর্ধন। বলিপাড়ার চেনা মুখ তিনি, কিন্তু প্রথম সারির তারকা সন্তানদের সঙ্গে তাঁকে দেখা যায় না। দক্ষিণী পরিচালকের হাত ধরে এবার বলিউডে পা রাখতে চলেছেন গোবিন্দ-পুত্র। ছবিটি পরিচালনা করবেন, জনপ্রিয় তেলুগু ছবি ‘বেবি’র পরিচালক সাই রাজেশ। এছাড়া প্রযোজনার দায়িত্বে থাকবেন অল্লু অরবিন্দ। তবে কোন চরিত্রে যশবর্ধনের দেখা মিলবে সেটা স্পষ্ট নয়। শুটিং শুরু হবে শীঘ্রই।



■ যশবর্ধন আহুজা

স্থগিত কাজ

মাতৃত্বের স্বাদ উপভোগ করতে চান দীপিকা। তাই তো ছোট্ট দুয়াকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল হতে দিচ্ছেন না অভিনেত্রী। অভিনয় থেকে নিজেকে বেশ কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখেছেন। ‘লেডি সিংহম’-কে আবারও নতুন ভাবে পর্দায় কবে দেখা যাবে? এ প্রশ্ন সকলের। তবে সন্তান হওয়ার পর দীপিকা বলেছিলেন, তিনি মেয়েকেই এখন সময় দিতে চান। নিজের হাতে বড় করতে চান তাকে। দীপিকার কারণেই এখন বন্ধ রয়েছে ‘কল্কি’ ছবির সিকোয়েলের শুটিং। দীপিকাকে ছাড়া নাগ অশ্বিনের এই ছবির পরবর্তী পর্যায় অসম্পূর্ণ। সেভাবেই প্রস্তুত করা হয়েছে চিত্রনাট্য। দীপিকা কাজে না ফেরা পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে শুটিং পর্ব। আগামী দিনে কপ ইউনিভার্সের মূল কান্ডারী হতে চলেছেন তিনি। স্থগিত রয়েছে সেই ছবির কাজও।

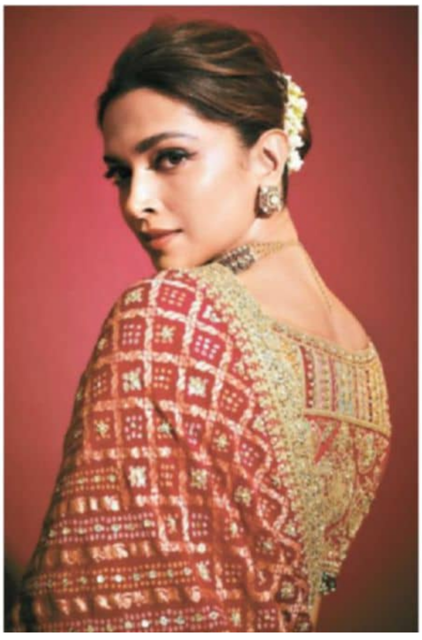
■ দীপিকা পাড়ুকোন

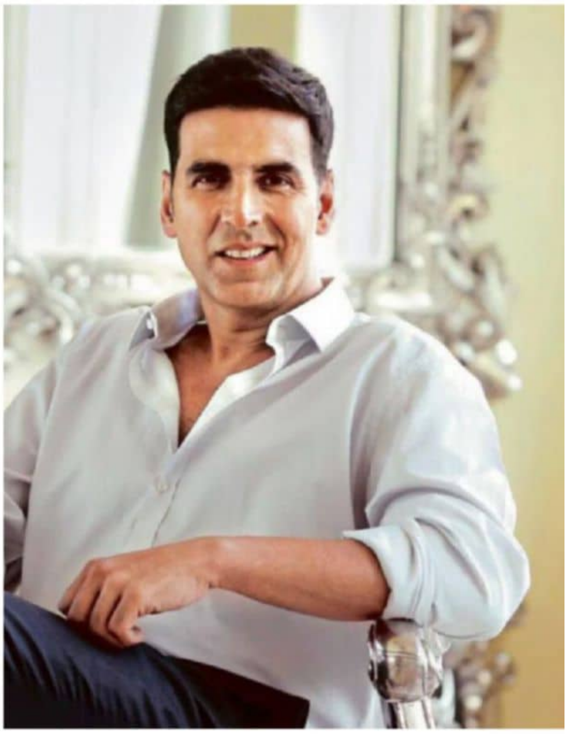


■ সলমন খান

সলমনের বাড়তি নিরাপত্তা

একের পর এক হুমকি, প্রাণনাশের আশঙ্কা! সলমন খানের জীবনে বিপদে য়েছে মুম্বই পুলিশের কড়া নিরাপত্তা। প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে পা রাখেন না ভাইজান। সঙ্গে থাকে কমপক্ষে ৪০ জন নিরাপত্তারক্ষী। বাবা সিদ্দিকির মৃত্যুর পর ভয় আরও বেড়েছে। শুধু সলমন নন, বলিপাড়ার অনেকেই পেয়েছেন প্রাণনাশের হুমকি। তাই বাড়তি নিরাপত্তা হিসেবে ভাইজানের বাড়ির বারান্দা ঘিরে ফেলা হল বুলেটপ্রুফ কাচ দিয়ে। ইদ বা অন্য বিশেষ দিনে এই বারান্দায় দাঁড়িয়েই ভক্তদের দেখা দিতেন তিনি। এত দিন পর্দায় ঢাকা ছিল বারান্দাটি। এবার তা বুলেটপ্রুফ কাচে পুরোপুরি ঘেরা। এছাড়া বাড়ির বেশ কিছু জায়গায় চলছে মেরামতির কাজ। উদ্দেশ্য একটাই, অধিক নিরাপত্তা। গত বছর বুলেটপ্রুফ গাড়িও কিনেছেন সলমন। তবে অন্যদিকে ছবির শুটিংও করছেন ভাইজান।





■ অক্ষয়কুমার

পুরনো রান্নায় নতুন মশলা

হরর-কমেডি ছবিতে অক্ষয়কুমারের উপস্থিতি এক আলাদা মাত্রা এনে দেয়। হিন্দি ছবির দর্শকরা এমনটাই মনে করেন। এ কথায় বারবার প্রলেপ দিয়েছে ‘ভুলভুলাইয়া’ ফ্র্যাঞ্চাইজির ছবিগুলি, যেখানে দেখা মেলেনি অক্ষয়ের। দীর্ঘ কয়েক বছর পর আবারও হরর কমেডি ছবি নিয়ে ফিরছেন অক্ষয়কুমার। সঙ্গে রয়েছেন প্রিয়দর্শনও। ছবির নাম ‘ভুত বাংলো’। যেখানে ‘ভুলভুলাইয়া’ ছবির শুটিং হয়েছিল, রাজস্থানের ওই একই দুর্গে এই ছবিরও শুটিং চলছে। কাস্টিংয়েও রয়েছে আগের মতোই বেশ কিছু চেনা মুখ। রাজপাল যাদব, আসরানি, পরেশ রাওয়ালসহ আরও অন্যান্য অভিনেতার দেখা মিলবে এই ছবিতে। এছাড়া থাকবেন তব্বু এবং ওয়ামিকা গাব্বি। তবে গল্প একেবারেই নতুন। পরিচালকের আশ্বাস, কোনওভাবেই পুরনো গল্পের সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে না।

JOY

PRESENTS

আনন্দলোক
পুরস্কার ২০২৫

CO-POWERED BY BudLeaf tea

সিনেমা (দর্শকের পছন্দে)

সেরা অভিনেতা
মিঠুন চক্রবর্তী (সন্তান)
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (অযোগ্য)
জিৎ (বুমেরাং)
দেব (খাদান)
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (বহুরূপী)
অঙ্কুশ (মির্জ়া)
বিক্রম চট্টোপাধ্যায় (পারিয়া)

সেরা অভিনেত্রী
ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (অযোগ্য)
শুভশ্রী (বাবলি)
মিমি চক্রবর্তী (আলাপ)
কৌশানী মুখোপাধ্যায় (বহুরূপী)
ঐন্দ্রিলা সেন (মির্জ়া)
রুক্মিণী মৈত্র (বুমেরাং)
অপরাজিতা আঢ্য
(এটা আমাদের গল্প)

সেরা পরিচালক
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-
নন্দিতা রায় (বহুরূপী)
কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় (অযোগ্য)
রাজ চক্রবর্তী (সন্তান)
তথাগত মুখোপাধ্যায় (পারিয়া)
শৌভিক কুণ্ডু (বুমেরাং)
মানসী সিনহা (এটা আমাদের গল্প)
সুজিত রিনো দত্ত (খাদান)
প্রতীম ডি গুপ্ত (চালচিত্র)

সেরা সিনেমা
পারিয়া (প্রমোদ ফিল্মস)
মির্জ়া (অঙ্কুশ হাজরা মোশন পিকচার্স)
অযোগ্য (সুরিন্দর ফিল্মস)
বুমেরাং (জিৎজ় ফিল্মওয়ার্কস)
বহুরূপী (উইন্ডোজ় প্রোডাকশন হাউজ়)
খাদান (সুরিন্দর ফিল্মস ও
দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্স)
সন্তান (এসভিএফ ও আরসিপি)
চালচিত্র (ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশনস)

খল চরিত্রে সেরা
কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় (মির্জ়া)
ঋত্বিক চক্রবর্তী (সন্তান)
যীশু সেনগুপ্ত (খাদান)
শ্রাবন্তী (সাদা রঙের পৃথিবী)
অনির্বাণ ভট্টাচার্য (অথৈ)
সৌম্য মুখোপাধ্যায় (পারিয়া)

সেরা নবাগত
শাওন চক্রবর্তী (চালচিত্র এখন)
রোশনি ভট্টাচার্য (অতি উত্তম)
অঙ্গনা রায় (পারিয়া)
ইধিকা পাল (খাদান)

সেরা সহ-অভিনেতা
চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী (দাবাড়ু)
অঞ্জন দত্ত (চালচিত্র এখন)
শুভশ্রী (সন্তান)
অনির্বাণ চক্রবর্তী (চালচিত্র)
শিলাজিৎ মজুমদার (অযোগ্য)
তনিকা বসু (চালচিত্র)

ওটিটি (দর্শকের পছন্দে)

সেরা অভিনেতা
চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী (নিকষ ছায়া, হইচই)
দেবদত্ত রাহা (তালমার রোমিও
জুলিয়েট, হইচই)
টোটা রায়চৌধুরী
(যাহা বলিব সত্য বলিব, হইচই)
অনিন্দ্য সেনগুপ্ত
(প্রেমে পড়া বারণ, আড্ডা টাইমস)
অনুজয় চট্টোপাধ্যায় (লজ্জা, হইচই)
অর্পণ ঘোষাল
(রাজা রানি রোমিও, ক্লিক)
রজতাভ দত্ত
(ইনস্পেক্টর নলিনীকান্ত ২, ক্লিক)

সেরা অভিনেত্রী
প্রিয়াঙ্কা সরকার (লজ্জা, হইচই)
সন্দীপ্তা সেন (নষ্টনীড় ২, হইচই)
পাওলি দাম (কাবেরী, হইচই)
হিয়া রায় (তালমার রোমিও
জুলিয়েট, হইচই)
অমৃতা চট্টোপাধ্যায় (ইনস্পেক্টর
নলিনীকান্ত ২, ক্লিক)
দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায় (প্রেমে পড়া
বারণ, আড্ডা টাইমস)
সৌমিতৃষা কুণ্ডু (কালরাত্রি, হইচই)

সেরা পরিচালক
অর্পণ গড়াই (তালমার রোমিও
জুলিয়েট, হইচই)
সৃজিত মুখোপাধ্যায়
(ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর, হইচই)
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজা রানি
রোমিও, ক্লিক)
অরিজিৎ টোটন চক্রবর্তী
(প্রেমে পড়া বারণ, আড্ডা টাইমস)
অয়ন চক্রবর্তী (কালরাত্রি, হইচই)
পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়
(নিকষ ছায়া, হইচই)

সেরা সিরিজ়
তালমার রোমিও জুলিয়েট (হইচই)
কালরাত্রি (হইচই)
লজ্জা (হইচই)
রাজা রানি রোমিও (ক্লিক)
প্রেমে পড়া বারণ (আড্ডা টাইমস)
ইনস্পেক্টর নলিনীকান্ত ২ (ক্লিক)

রেডিয়ো পার্টনার
91.9 friends fm

ডিজিটাল পার্টনার
আরও আনন্দ

বিনোদনের সেরা মঞ্চে
বিনোদনের সেরা সম্মান !

টেলিভিশন (দর্শকের পছন্দে)

সেরা অভিনেতা
সাহেব ভট্টাচার্য (কথা, স্টার জলসা)
গৌরব চট্টোপাধ্যায় (তেঁতুল পাতা, স্টার জলসা)
রুবেল দাস (নিমফুলের মধু, জ়ি বাংলা)
নীল ভট্টাচার্য (অমর সঙ্গী, জ়ি বাংলা)
রাজদীপ গুপ্ত (দ্বিতীয় বসন্ত, সান বাংলা)
রণজয় বিষ্ণু (কোন গোপনে মন ভেসেছে, জ়ি বাংলা)
আদৃত রায় (মিত্তির বাড়ি, জ়ি বাংলা)

সেরা অভিনেত্রী
হিয়া মুখোপাধ্যায় (গীতা এলএলবি, স্টার জলসা)
পল্লবী শর্মা (নিমফুলের মধু, জ়ি বাংলা)
সোনামনি সাহা (শুভ বিবাহ, স্টার জলসা)
সুস্মিতা দে (কথা, স্টার জলসা)
দিব্যাণী মণ্ডল (ফুলকি, জ়ি বাংলা)
পায়েল দে (কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, সান বাংলা)
অঙ্কিতা মল্লিক (জগদ্ধাত্রী, জ়ি বাংলা)

সেরা ধারাবাহিক
ফুলকি (জ়ি বাংলা)
নিমফুলের মধু (জ়ি বাংলা)
গীতা এলএলবি (স্টার জলসা)
কথা (স্টার জলসা)
বসু পরিবার (সান বাংলা)
সোহাগ চাঁদ (কালার্স বাংলা)
জগদ্ধাত্রী (জ়ি বাংলা)

খল চরিত্রে সেরা
অহনা দত্ত (অনুরাগের ছোঁয়া, স্টার জলসা)
মানসী সেনগুপ্ত (নিমফুলের মধু, জ়ি বাংলা)
সুদীপ সরকার (ফুলকি, জ়ি বাংলা)
অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (কথা, স্টার জলসা)
নীল চট্টোপাধ্যায় (কোন গোপনে মন ভেসেছে, জ়ি বাংলা)
সুপ্রিয় দত্ত (গীতা এলএলবি, স্টার জলসা)
দেবাদৃতা বসু (মিঠিঝোরা, জ়ি বাংলা)

সঙ্গীত (দর্শকের পছন্দে)

সেরা গায়ক (সিনেমা)
রূপম ইসলাম (অযোগ্য আমি, অযোগ্য)
ননীচোরা দাস বাউল (শিমুল পলাশ, বহুরূপী)
রথীজিৎ ভট্টাচার্য (কিশোরী, খাদান)
দেব অরিজিৎ (রাজার রাজা, খাদান)
ঈশান মিত্র (গালিব, মির্জ়া)

সেরা গায়িকা (সিনেমা)
শ্রেয়া ঘোষাল (তুই আমার হবি না, অযোগ্য)
সোমলতা আচার্য চৌধুরী (আবহাওয়া বলে দেয়, আলাপ)
শ্রেষ্ঠা দাস (ডাকাতিয়া বাঁশি, শিমুল পলাশ, বহুরূপী)
অন্তরা মিত্র (কিশোরী, খাদান)
ইমন চক্রবর্তী (বোলো তারে, চালচিত্র)

সেরা সঙ্গীত পরিচালক
রথীজিৎ ভট্টাচার্য (কিশোরী, খাদান)
অনুপম রায় (অযোগ্য আমি, অযোগ্য)
বনি চক্রবর্তী (ডাকাতিয়া বাঁশি, শিমুল পলাশ, বহুরূপী)
স্যাভি (রাজার রাজা, খাদান)
জিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (তোমার আকাশে, সন্তান)
অনীক ধর (এল মির্জ়া, মির্জ়া)
রণজয় ভট্টাচার্য (তোমায় ছেড়ে যেতে পারলাম কই, টেক্কা)

কোন বিভাগে
সেরা কে,
QR কোডটি স্ক্যান করে ভোট দিন,
২০ জানুয়ারির মধ্যে।



JOY

PRESENTS

আনন্দলোক

পুরস্কার ২০২৫

CO-POWERED BY BudLeaf tea

সিনেমা (দর্শকের পছন্দে)

সেরা অভিনেতা
মিঠুন চক্রবর্তী (সন্তান)
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (অযোগ্য)
জিৎ (বুমেরাং)
দেব (খাদান)
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (বহুরূপী)
অঙ্কুশ (মির্জ়া)
বিক্রম চট্টোপাধ্যায় (পারিয়া)

সেরা অভিনেত্রী
ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (অযোগ্য)
শুভশ্রী (বাবলি)
মিমি চক্রবর্তী (আলাপ)
কৌশানী মুখোপাধ্যায় (বহুরূপী)
ঐন্দ্রিলা সেন (মির্জ়া)
রুক্মিণী মৈত্র (বুমেরাং)
অপরাজিতা আঢ্য
(এটা আমাদের গল্প)

সেরা পরিচালক
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-
নন্দিতা রায় (বহুরূপী)
কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় (অযোগ্য)
রাজ চক্রবর্তী (সন্তান)
তথাগত মুখোপাধ্যায় (পারিয়া)
শৌভিক কুণ্ডু (বুমেরাং)
মানসী সিনহা (এটা আমাদের গল্প)
সুজিত রিনো দত্ত (খাদান)
প্রতীম ডি গুপ্ত (চালচিত্র)

সেরা সিনেমা
পারিয়া (প্রমোদ ফিল্মস)
মির্জ়া (অঙ্কুশ হাজরা মোশন পিকচার্স)
অযোগ্য (সুরিন্দর ফিল্মস)
বুমেরাং (জিৎজ় ফিল্মওয়র্কস)
বহুরূপী (উইন্ডোজ় প্রোডাকশন হাউজ়)
খাদান (সুরিন্দর ফিল্মস ও
দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্স)
সন্তান (এসভিএফ ও আরসিপি)
চালচিত্র (ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশনস)

খল চরিত্রে সেরা
কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় (মির্জ়া)
ঋত্বিক চক্রবর্তী (সন্তান)
যীশু সেনগুপ্ত (খাদান)
শ্রাবন্তী (সাদা রঙের পৃথিবী)
অনির্বাণ ভট্টাচার্য (অথৈ)
সৌম্য মুখোপাধ্যায় (পারিয়া)

সেরা নবাগত
শাওন চক্রবর্তী (চালচিত্র এখন)
রোশনি ভট্টাচার্য (অতি উত্তম)
অঙ্গনা রায় (পারিয়া)
ইধিকা পাল (খাদান)

সেরা সহ-অভিনেতা
চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী (দাবাড়ু)
অঞ্জন দত্ত (চালচিত্র এখন)
শুভশ্রী (সন্তান)
অনির্বাণ চক্রবর্তী (চালচিত্র)
শিলাজিৎ মজুমদার (অযোগ্য)
তনিকা বসু (চালচিত্র)

ওটিটি (দর্শকের পছন্দে)

সেরা অভিনেতা
চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী (নিকষ ছায়া, হইচই)
দেবদত্ত রাহা (তালমার রোমিও
জুলিয়েট, হইচই)
টোটা রায়চৌধুরী
(যাহা বলিব সত্য বলিব, হইচই)
অনিন্দ্য সেনগুপ্ত
(প্রেমে পড়া বারণ, আড্ডা টাইমস)
অনুজয় চট্টোপাধ্যায় (লজ্জা, হইচই)
অর্পণ ঘোষাল
(রাজা রানি রোমিও, ক্লিক)
রজতাভ দত্ত
(ইনস্পেক্টর নলিনীকান্ত ২, ক্লিক)

সেরা অভিনেত্রী
প্রিয়াঙ্কা সরকার (লজ্জা, হইচই)
সন্দীপ্তা সেন (নষ্টনীড় ২, হইচই)
পাওলি দাম (কাবেরী, হইচই)
হিয়া রায় (তালমার রোমিও
জুলিয়েট, হইচই)
অমৃতা চট্টোপাধ্যায় (ইনস্পেক্টর
নলিনীকান্ত ২, ক্লিক)
দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায় (প্রেমে পড়া
বারণ, আড্ডা টাইমস)
সৌমিতৃষা কুণ্ডু (কালরাত্রি, হইচই)

সেরা পরিচালক
অর্পণ গড়াই (তালমার রোমিও
জুলিয়েট, হইচই)
সৃজিত মুখোপাধ্যায়
(ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর, হইচই)
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজা রানি
রোমিও, ক্লিক)
অরিজিৎ টোটন চক্রবর্তী
(প্রেমে পড়া বারণ, আড্ডা টাইমস)
অয়ন চক্রবর্তী (কালরাত্রি, হইচই)
পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়
(নিকষ ছায়া, হইচই)

সেরা সিরিজ়
তালমার রোমিও জুলিয়েট (হইচই)
কালরাত্রি (হইচই)
লজ্জা (হইচই)
রাজা রানি রোমিও (ক্লিক)
প্রেমে পড়া বারণ (আড্ডা টাইমস)
ইনস্পেক্টর নলিনীকান্ত ২ (ক্লিক)

রেডিয়ো পার্টনার
91.9 friends fm

ডিজিটাল পার্টনার
আরও আনন্দ

বিনোদনের সেরা মঞ্চে
বিনোদনের সেরা সম্মান !

টেলিভিশন (দর্শকের পছন্দে)

সেরা অভিনেতা
- **সাহেব ভট্টাচার্য** (কথা, স্টার জলসা)
- **গৌরব চট্টোপাধ্যায়** (তেঁতুল পাতা, স্টার জলসা)
- **রুবেল দাস** (নিমফুলের মধু, জ়ি বাংলা)
- **নীল ভট্টাচার্য** (অমর সঙ্গী, জ়ি বাংলা)
- **রাজদীপ গুপ্ত** (দ্বিতীয় বসন্ত, সান বাংলা)
- **রণজয় বিষ্ণু** (কোন গোপনে মন ভেসেছে, জ়ি বাংলা)
- **আদৃত রায়** (মিত্তির বাড়ি, জ়ি বাংলা)

সেরা অভিনেত্রী
- **হিয়া মুখোপাধ্যায়** (গীতা এলএলবি, স্টার জলসা)
- **পল্লবী শর্মা** (নিমফুলের মধু, জ়ি বাংলা)
- **সোনামনি সাহা** (শুভ বিবাহ, স্টার জলসা)
- **সুস্মিতা দে** (কথা, স্টার জলসা)
- **দিব্যাণী মণ্ডল** (ফুলকি, জ়ি বাংলা)
- **পায়েল দে** (কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, সান বাংলা)
- **অঙ্কিতা মল্লিক** (জগদ্ধাত্রী, জ়ি বাংলা)

সেরা ধারাবাহিক
- **ফুলকি** (জ়ি বাংলা)
- **নিমফুলের মধু** (জ়ি বাংলা)
- **গীতা এলএলবি** (স্টার জলসা)
- **কথা** (স্টার জলসা)
- **বসু পরিবার** (সান বাংলা)
- **সোহাগ চাঁদ** (কালার্স বাংলা)
- **জগদ্ধাত্রী** (জ়ি বাংলা)

খল চরিত্রে সেরা
- **অহনা দত্ত** (অনুরাগের ছোঁয়া, স্টার জলসা)
- **মানসী সেনগুপ্ত** (নিমফুলের মধু, জ়ি বাংলা)
- **সুদীপ সরকার** (ফুলকি, জ়ি বাংলা)
- **অর্পিতা মুখোপাধ্যায়** (কথা, স্টার জলসা)
- **নীল চট্টোপাধ্যায়** (কোন গোপনে মন ভেসেছে, জ়ি বাংলা)
- **সুপ্রিয় দত্ত** (গীতা এলএলবি, স্টার জলসা)
- **দেবাদৃতা বসু** (মিঠিঝোরা, জ়ি বাংলা)

সঙ্গীত (দর্শকের পছন্দে)

সেরা গায়ক (সিনেমা)
- **রূপম ইসলাম** (অযোগ্য আমি, অযোগ্য)
- **ননীচোরা দাস বাউল** (শিমুল পলাশ, বহুরূপী)
- **রথীজিৎ ভট্টাচার্য** (কিশোরী, খাদান)
- **দেব অরিজিৎ** (রাজার রাজা, খাদান)
- **ঈশান মিত্র** (গালিব, মির্জা)

সেরা গায়িকা (সিনেমা)
- **শ্রেয়া ঘোষাল** (তুই আমার হবি না, অযোগ্য)
- **সোমলতা আচার্য চৌধুরী** (আবহাওয়া বলে দেয়, আলাপ)
- **শ্রেষ্ঠা দাস** (ডাকাতিয়া বাঁশি, শিমুল পলাশ, বহুরূপী)
- **অন্তরা মিত্র** (কিশোরী, খাদান)
- **ইমন চক্রবর্তী** (বোলো তারে, চালচিত্র)

সেরা সঙ্গীত পরিচালক
- **রথীজিৎ ভট্টাচার্য** (কিশোরী, খাদান)
- **অনুপম রায়** (অযোগ্য আমি, অযোগ্য)
- **বনি চক্রবর্তী** (ডাকাতিয়া বাঁশি, শিমুল পলাশ, বহুরূপী)
- **স্যাভি** (রাজার রাজা, খাদান)
- **জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়** (তোমার আকাশে, সন্তান)
- **অনীক ধর** (এল মির্জা, মির্জা)
- **রণজয় ভট্টাচার্য** (তোমায় ছেড়ে যেতে পারলাম কই, টেক্কা)

কোন বিভাগে সেরা কে,

QR কোডটি স্ক্যান করে ভোট দিন, ২০ জানুয়ারির মধ্যে।



JOY

PRESENTS

আনন্দলোক
পুরস্কার ২০২৫

CO-POWERED BY BudLeaf

বিনোদনের সেরা মঞ্চে
বিনোদনের সেরা সম্মান!

সিনেমা (বিচারকের পছন্দে)

সেরা অভিনেতা
- পরান বন্দ্যোপাধ্যায় (বেলাইন)
- চন্দন সেন (মানিকবাবুর মেঘ)
- অঞ্জন দত্ত (চালচিত্র এখন)
- আবীর চট্টোপাধ্যায় (শ্রীস্বপনকুমারের বাদামী হায়নার কবলে)
- অর্ণ মুখোপাধ্যায় (অথৈ)

সেরা অভিনেত্রী
- সোহিনী সরকার (অথৈ)
- শ্রেয়া ভট্টাচার্য (বেলাইন)
- অনসূয়া মজুমদার (সন্তান)
- মনামী ঘোষ (পদাতিক)
- শ্রুতি দাস (শ্রীস্বপনকুমারের বাদামী হায়নার কবলে)

সেরা পরিচালক
- অঞ্জন দত্ত (চালচিত্র এখন)
- সৃজিত মুখোপাধ্যায় (পদাতিক)
- দেবালয় ভট্টাচার্য (শ্রীস্বপনকুমারের বাদামী হায়নার কবলে)
- অর্ণ মুখোপাধ্যায় (অথৈ)
- শমীক রায়চৌধুরী (বেলাইন)
- অভিনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (মানিকবাবুর মেঘ)

সেরা সিনেমা
- পদাতিক (ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশনস)
- বেলাইন (হরিৎ রত্ন ও মনীষা রত্ন)
- অথৈ (এসভিএফ)
- মানিকবাবুর মেঘ (বৌদ্ধায়ন ও মোনালিসা মুখোপাধ্যায়)
- শ্রীস্বপনকুমারের বাদামী হায়নার কবলে (হইচই স্টুডিওস)
- চালচিত্র এখন (অঞ্জন দত্ত প্রোডাকশনস)



রেডিয়ো পার্টনার
91.9 friends fm

ডিজিটাল পার্টনার
আরও আনন্দ

পার্টি সিজ়ন এখনও ফুল অন। সেলিব্রেশন, খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে তারকাদের ছবির সাকসেস পার্টি, নতুন ছবির প্রচার, সব লেগেই আছে। সঙ্গে রয়েছে আনন্দলোক







১ ‘খাদান’-এর সাকসেস পার্টিতে দেব এবং যীশু সেনগুপ্তর সেলফি

২ মুম্বইয়ে এক ফ্যাশন ইভেন্টে ক্যামেরার লেন্সের সামনে ধরা দিলেন মলাইকা অরোরা

৩ বাংলা ছবি ‘বিনোদিনী’র প্রথম গান লঞ্চ অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনা করলেন রুক্মিণী মৈত্র

৭ ‘খাদান’-এর স্পেশ্যাল স্ক্রিনিংয়ে প্রসেনজিৎ ও দেব

৮ একটি অনুষ্ঠানে সলমন খান ও ববি দেওলের সেলফি



৭

৮



ছবিগুলো তুলেছেন
প্রবীর মিত্র: ৯
অনির্বাণ সাহা: ৭



৯

১০





১১



১২



১৩

৯ নতুন বাংলা ছবি 'ফেলু বক্সী'র ট্রেলার লঞ্চে উপস্থিত মধুমিতা সরকার এবং সোহম

১০ মুম্বইতে নতুন হিন্দি ছবি 'ফতেহ'-এর প্রচারে সোনু সুদ ও জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ়

১১ অমৃতসরের গোল্ডেন টেম্পল দর্শনে সস্ত্রীক সুনীল শেট্টি

১২ একটি নতুন শো-রুমের উদ্বোধনে উপস্থিত দর্শনা বণিক

১৩ ধর্মেন্দ্রর জন্মদিনে দুই ছেলে ববি ও সানির সঙ্গে



শ্যাম, এক বিদ্রোহীর নাম

তাঁর আপত্তি ছিল ‘সমান্তরাল ছবি’ শব্দবন্ধে। অথচ সেই ধারার ছবিরই পোস্টারবয় **শ্যাম বেনেগল**, চেতনা এবং বিনোদন যাঁর ছবিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেছে। লিখছেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

হিন্দি ছবির সমান্তরাল তরঙ্গ নিয়ে কথা বললে শ্যাম বেনেগলের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়। কিন্তু প্যারালাল সিনেমার ধারায় দেশের রাজনীতি এবং শাসকের নীতিরও বড় ভূমিকা ছিল। যেমন সরকার নিয়ন্ত্রিত ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন দ্বারা ছবির প্রযোজনা বা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে ছবির কলাকুশলী তৈরি। সেটিই আর্ট ফিল্ম এবং প্যারালাল ছবির মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়। তবে মৃণাল সেন, মণি কওল, জন এব্রাহাম, কুমার সাহানি, এম এস সাথ্যুর

ছবি যেমন সরকারি ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন বা এনএফডিসি দ্বারা প্রযোজিত, শ্যাম বেনেগলের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। শ্যামের প্রথম ছবি 'অঙ্কুর' মোটেই সরকারি অর্থে নির্মিত ছিল না। 'ব্লেজ় এন্টারটেনমেন্ট' নামের যে বিজ্ঞাপন সংস্থায় শ্যাম কাজ করতেন (সাড়ে তিনবছরে ২০০টির উপর বিজ্ঞাপন তৈরি করেছিলেন তিনি), সেই সংস্থার দুই কর্ণধার মোহন বিজলানি এবং ফ্রেনি ওয়ারিয়াভা স্বাধীনভাবে 'অঙ্কুর' এবং তারপর 'নিশান্ত', 'ভূমিকা', 'আরোহণ', 'মান্ডি', 'ত্রিকাল' প্রযোজনা করেছিলেন। ফলে সাত ও আটের দশকের প্যারালাল সিনেমার মতো সরকারি আনুকূল্য তিনি পাননি। তাঁর কেরিয়ারে বরং নয়ের দশকে 'মাম্মো', 'সূরজ কা সাতওয়াঁ ঘোড়া', 'দ্য মেকিং অফ দ্য মহাত্মা', 'হরি ভরি'-তে এনএফডিসি-র ফান্ডিং এসেছে। তা সত্ত্বেও শ্যামকেই প্যারালাল ছবির সেনাপতি বলে ধরে নেওয়া হয়। তার কারণ বিষয়বস্তু এবং মেকিং। সাতের দশকে সরকার, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ও সংস্কৃতি দফতর নীতি নিয়েছিল 'ভাল সিনেমা', যা দেশের অভ্যন্তর থেকে খুঁড়ে আনবে 'আসল ভারত', তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার। শ্যামের প্রথম ছবি 'অঙ্কুর' দুই প্রান্তিক মানুষ এবং সামন্ততান্ত্রিক পেষণের গল্প বলে। ছবির নায়ক মূক-বধির, নায়িকা দলিত নারী। 'অঙ্কুর' নামকরণ সেখানে একদিকে যেমন লক্ষ্মীর (শবানা অভিনীত) সন্তানকামনার প্রতীক, তেমনই দলিত সমাজের সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বীজ। অর্থাৎ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষদের গল্প শ্যাম তুলে আনলেন ছবিতে। সেখানে মেলোড্রামার পরিবর্তে স্থান পেল রূঢ় বাস্তব। সিনেমা কেবল বিনোদনের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ থাকল না, হয়ে উঠল বাস্তবের জলছবি।



■ 'নিশান্ত'-এর সেটে শ্যাম, অনন্ত নাগ, মোহন আগাসে, অমরীশ পুরী, শবানা, নাসিরুদ্দিন ও স্মিতা

শ্যামের পূর্বসূরিরা যেমন অনেকক্ষেত্রে হলমুক্তির সুযোগ পাননি, শ্যাম স্বাধীন প্রযোজকদের সঙ্গে সেই সুযোগ তৈরি করেছিলেন



■ শ্যাম ও তাঁর সিনেমাটোগ্রাফার গোবিন্দ নিহালনি

'মন্থন'-ই প্রথম

ভারতের প্রথম ক্রাউড ফান্ডেড ছবিও কিন্তু শ্যামের 'মন্থন'। ডা: ভার্গিস কুরিয়েন যেভাবে দেশে দুগ্ধ সমবায় গঠন করে শুভ্র বিপ্লব এনেছিলেন, সেই প্রক্রিয়ায় যেভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই গল্প তুলে আনার দায়িত্ব বোধ করেছিলেন শ্যাম। ফলে গুজরাতের কোঅপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন এই ছবির প্রযোজক কেবল নামে। আদতে পাঁচ লক্ষ কৃষকের মাথা পিছু দু'টাকা চাঁদায় যে অর্থ তোলা হয়েছিল, তা দিয়েই তৈরি ছবি 'মন্থন'। কখনও তিনি 'নিশান্ত'-এর মতো ছবিতে তুলে ধরেছেন জমিদারদের হাতে গ্রামের মহিলাদের যৌন নিগ্রহের গল্প ('নিশান্ত' কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পাম দি ওর বিভাগে মনোনীত হয়), কখনও চারের দশকের মরাঠী অভিনেত্রী হনসা ওয়াডকরের জীবন নিয়ে তৈরি করেছেন 'ভূমিকা'। আবার সিপাহী বিদ্রোহের আবহে 'জুনুন'-এ তৈরি করেছেন আর্ট ফিল্মের অনসম্বল কাস্ট।

তবে এই কারণে শ্যাম সমান্তরাল ধারার মুখ হয়ে ওঠেননি। সমান্তরাল ধারায় শ্যামের পূর্বসূরিরা যেমন অনেকক্ষেত্রে হলমুক্তির সুযোগ পাননি বা পরীক্ষামূলক চিত্রনির্মাণের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে দর্শক অবধি পৌঁছতে পারেননি, শ্যাম স্বাধীন প্রযোজক দ্বারা সিনেমা তৈরি করে দর্শকের কাছে সেই ছবি পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'অঙ্কুর' ছবির জন্য শবানা আজ়মী এবং সাধু মেহের সেরা



'আরোহণ'-এর শুটে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, ওম পুরী, শ্যাম ও তাঁর টিম

বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি নিয়ে স্নাতকোত্তর হন তিনি। কলেজে পড়াকালীনই সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখে মুগ্ধ হন শ্যাম। হায়দরাবাদ ফিল্ম সোসাইটি তৈরি করেন ছাত্রাবস্থায়। পরে অ্যাডফিল্মমেকিং এবং সিনেমার জন্য তিনি মুম্বইতে বসবাস করলেও হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানার সঙ্গে শিকড়ের টান তাঁর রয়েই গিয়েছিল। তাই বারবার ফিরে গিয়েছেন সেই রাজ্যে, সেই শহরে। প্রথম ছবি 'অঙ্কুর' শুট করেছিলেন হায়দরাবাদের নিকটবর্তী ইয়েল্লারেড্ডিগুডা গ্রামে, 'নিশান্ত-এর গল্প যেমন তেলেঙ্গানার সশস্ত্র আন্দোলনকে তুলে ধরেছিল, ছবির শুটিংও হয়েছিল সেখানেই। 'মান্ডি'র শুটিং হয়েছিল ভঙ্গির গ্রামে, 'সুসমান'-এর গল্প পোচমপল্লি কারিগরদের জীবন এবং ছবিটির শুটিং স্থল সেই গ্রাম-ই। শ্যাম আসলে ছবির ক্ষেত্রে অনেকবার বেছে নিয়েছেন নিজের

> গুজরাতের দুগ্ধ বিপ্লবের গল্প দেশ এবং দেশের বাইরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মিল্ক ফেডারেশন শ্যাম বেনেগলের উপর ভরসা করেছিল

অভিনেতার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন, ছবিটি সমালোচকদের মধ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকায় তৈরি ছবিটি প্রায় এক কোটি টাকার ব্যবসা এনে দিয়েছিল শ্যামকে। ফলে শ্যাম যে প্রান্তিক মানুষের গল্পকে বৃহত্তর দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেন, তা সকলে বুঝতে পেরেছিলেন। এই কারণেই গুজরাতের দুগ্ধ বিপ্লবের গল্প দেশ এবং দেশের বাইরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মিল্ক ফেডারেশন শ্যামের উপর ভরসা করেছিল। ছবিটিকে অস্কারে ভারতের এন্ট্রি হিসেবেও পাঠানো হয়। ছবিটি কৃষকদের মধ্যে সাড়া ফেলে এবং গ্রামের প্রেক্ষাগৃহেও মানুষ ভিড় করে ছবিটি দেখতে যান।

হৃদয়ে হায়দরাবাদ

১৯৩৪-এর ১৪ ডিসেম্বর কোঙ্কণী-ভাষী শ্যাম বেনেগলের জন্ম বেঙ্গালুরুতে, বেড়ে ওঠা হায়দরাবাদ শহরে। চিত্রগ্রাহক পিতার কাজের সূত্রে। সাইক্লিং এবং সাঁতারে স্টেট চ্যাম্পিয়ন ছিলেন শ্যাম। স্কুল পাশ করে প্রথমে নিজাম কলেজে, পরে ওসমানিয়া



ভারতের প্রথম ক্রাউড ফান্ডেড ছবি 'মন্থন'-এর দৃশ্যে স্মিতা পাটিল ও গিরিশ করনাড



'অঙ্কুর'-এর জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন সাধু মেহের ও শবানা আজ়মী



■ 'মান্ডি' ছবির দৃশ্যে ইলা অরুণ, শবানা ও স্মিতা

'বোস: দ্য ফরগটেন হিরো'। বাংলাদেশের ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন যখন দেশনায়ক মুজিবুর রেহমানকে নিয়ে ছবি তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তারাও অশীতিপর শ্যামের কথাই ভাবেন। আর যাঁর ছবি দেখে যুবক শ্যাম বিস্মিত হয়েছিলেন, সেই সত্যজিৎ রায়কে নিয়েও তৈরি করেছিলেন দারুণ এক তথ্যচিত্র। কেবল ফিচার ফিল্ম নয়, তিনি ৪১টি তথ্যচিত্র বানিয়েছিলেন, ছ'টি টিভি সিরিজ়!

নারীবাদী শ্যাম

বাণিজ্যিক ছবির ক্ষেত্রে সাত ও আটের দশকের ছবি একটি অদ্ভুত ধারা আনে। পুরুষকেন্দ্রিক ছবি, সাতের দশকের অ্যাংরি ইয়ং ম্যান বা তারপর অ্যাংরি এইট্টিজ়। সেখানে মহিলা চরিত্রগুলো কেবল কম পরিসর পেত, তা-ই নয়। নেহাতই শোভাবর্ধনের 'এলিমেন্ট' হিসেবে তাদের ছবিতে ব্যবহার করা হত। শুধু তখন কেন? সেই 'অ্যাংরি এইট্টিজ়'-এর ধারা ফিরিয়ে এনেছে আজকের রুদ্রংদেহী নায়ককেন্দ্রিক অ্যাকশন ড্রামা। আজও তো সেই ছবিতে মহিলাদের পরিসর খুবই কম। কিন্তু শ্যাম সেই অর্থে 'ফেমিনিস্ট' পরিচালক ছিলেন। তিনি এমন অভিনেতাদের তুলে এনেছিলেন

> শ্যাম ছিলেন ফেমিনিস্ট। তাঁর ছবির স্ক্রিপ্ট, চরিত্রায়ণ বা শুটিং সেটে অভিনেতাদের মধ্যে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ কোনওদিন ছিল না

প্রিয় মানুষদের। জওহরলাল নেহরু তখন প্রধানমন্ত্রী। শ্যামের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে সাধারণ মানুষের মতো সাধারণের মাঝে মিশে গিয়েছিলেন নেহরু, তা প্রভাবিত করেছিল শ্যামকে। পরে তিনি নেহরুকে নিয়ে তথ্যচিত্র বানিয়েছিলেন। নেহরুর লেখা 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' নিয়ে শ্যাম একটি টিভি সিরিজ়ও বানিয়েছিলেন। সেখানে হিন্দু অভিনেতা ওম পুরী একটি পর্বে ঔরঙ্গজেব এবং মুসলিম অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ হয়েছিলেন ছত্রপতি শিবাজী। অর্থাৎ কেবল নেহরুর লেখা নয়, তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শনকে কাস্টিংয়ে নিয়ে এসেছিলেন শ্যাম। গান্ধীকে নিয়ে যেমন 'দ্য মেকিং অফ দ্য মহাত্মা' বানিয়েছিলেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, গান্ধীকে দেশবাসী ভুল বোঝে! বর্মা থেকে ছোটবেলায় তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন



■ 'জুনুন'-এর দৃশ্য শশী কপুর ও নাসিরুদ্দিন, ছবির প্রযোজক ছিলেন শশী ও শ্যাম

এক কাকা, যাঁর ছোট ভাই ভর্তি হয়েছিলেন আজ়াদ হিন্দ ফৌজে। ছোটবেলার সেই গল্প শ্যাম ভুলে যাননি, সেই তখন থেকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসকে নিয়ে খননকার্য চালিয়ে, শেষের দিকে তৈরি করেছিলেন

নিজের ছবিতে, যাঁরা নিজেদের ট্যালেন্টের জোরে পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছিলেন। 'লিঙ্গ' সেখানে কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এই লিঙ্গভেদ কখনও শবানা আজ়মী এবং নাসিরুদ্দিন শাহের মধ্যে চোখে পড়েনি, স্মিতা



■ 'মাম্মো' ছবির দৃশ্যে রজিত কপূর, ফরিদা জলাল ও সুরেখা সিক্রি

> এমএ পাশ করে যখন বম্বে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন কপর্দকশূন্য শ্যাম আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রিয় বৌদি গীতা দত্তর বাড়িতেই

পাটিল এবং ওম পুরী বা গিরিশ করনাডের মধ্যে লিঙ্গভেদের কারণে কেউ উনিশ-বিশ হয়ে ওঠেননি। পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে তো নয়ই। এই যে নারীবাদী ইকোসিস্টেম শ্যাম তৈরি করতে পেরেছিলেন সেই সময়ে, তা এক ফেমিনিস্ট পরিচালক তথা মানুষেরই পরিচয়। এই ইকোসিস্টেমে কেবল অভিনেতারা নন, টেকনিশিয়ানদেরও সমান সম্মান এবং উন্নতির পরিসর তৈরি করতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর প্রথম দিকের ছবিগুলোর সিনেমাটোগ্রাফার ছিলেন গোবিন্দ নিহালনি, যিনি পরবর্তীকালে আর্ট ফিল্মের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে। সেখানে শ্যাম হয়ে উঠেছিলেন তাঁর মেন্টর। নারীকেন্দ্রিক ছবি নিয়ে এখনও যে হাহুতাশ শোনা যায় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে, তার উত্তর শ্যাম দিয়েছিলেন 'ভূমিকা', 'মান্ডি', 'মাম্মো', 'সর্দারী বেগম', 'জুবেদা'র মতো ছবি পরিচালনা করে। এই কারণেই সাধু মেহের, শবানা আজ়মী, স্মিতা পাটিল, নাসিরুদ্দিন শাহ, ওম পুরী, অমরীশ পুরী, কুলভূষণ খরবন্দা, গিরিশ করনাড, দীপ্তি নভল, দিব্যা দত্ত, রজিত কপূরের মতো একডজনেরও বেশি অভিনেতা 'শ্যামবাবু'-কে নিজেদের মেন্টর বলে মনে করেছেন বরাবর। তিনি 'স্টার সিস্টেম'-এ



■ 'বোস: দ্য ফরগটেন হিরো'র সেটে, পাশে শচীন খেড়েকর

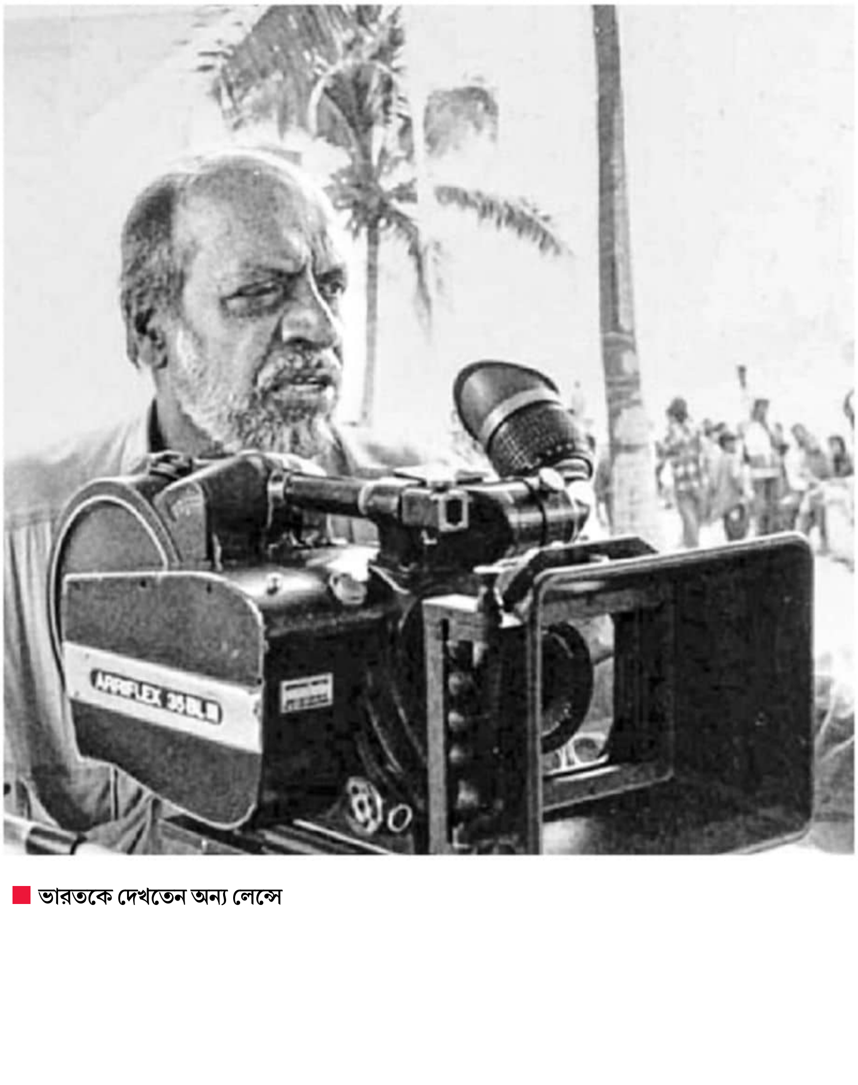
বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু নিজের জাদুদণ্ডে তিনি সত্যিই একটা প্যারালাল স্টার সিস্টেম তৈরি করেছিলেন, যতই 'প্যারালাল' শব্দে তাঁর আপত্তি থাকুক না কেন। তাঁর আবিষ্কৃত অভিনেতারা নিজেদের কেরিয়ারে তথাকথিত কমার্শিয়াল ছবিতে অভিনয় করেছেন আর্থিক সুরক্ষার জন্য। তবে শ্যাম কিন্তু নিজের ধারা ছেড়ে বেরোননি কোনওদিন। আঁকড়ে ধরে রেখেছেন চিত্রনির্মাণের সেই ধারা, যা তাঁর বিশ্বাসের মাটিতে তৈরি।

মূলস্রোতের বিদ্রোহী পরিচালক

একজন স্বচ্ছ এবং সৎ মানুষ স্বীকার করতে পারেন, 'গুরু দত্তকে আমি খুব একটা অ্যাডমায়ার করতাম না। কিন্তু হিংসে করতাম। কারণ সিনেমা করে ওর অনেক প্রতিপত্তি হয়েছিল, আমরা তুতো ভাই ছিলাম তো, তাই...' শ্যাম বেনেগল এমন কথা সহজেই বলতে পারতেন, বলেছিলেন। গুরু দত্তর দিদিমা এবং শ্যামের ঠাকুরমা ছিলেন দুই বোন। একদিকে যেমন শ্যাম দাদার 'সাহেব বিবি অউর গুলাম'-কে উচ্চতায় রাখেন, অন্যদিকে 'কাগজ় কে ফুল'-এর মতো সাধারণ ছবির জন্য গুরু দত্তর স্টারডম নিয়ে ঈর্ষাবোধও করতেন। তিনি নিজে একাত্মবোধ করতেন সত্যজিৎ রায়ের ছবির সঙ্গে। তবে তাই বলে গুরু দত্তর সঙ্গে কোনও বৈরিতা ছিল না শ্যামের। বরং বন্ধুত্বই ছিল, বেশি পছন্দ করতেন বৌদি গীতা দত্তকে। তাই তো এমএ পাশ করে যখন বম্বে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন কপর্দকশূন্য শ্যাম আশ্রয় নিয়েছিলেন গীতা দত্তর বাড়িতেই। অ্যাড এজেন্সিতে চাকরি নেওয়ার পর তাঁর প্রথম অফিস ছিল জ্যোতি স্টুডিয়োর একটি ঘরে। ভারতের প্রথম সাউন্ড স্টুডিয়ো, যেখানে 'আলম আরা'র শুটিং হয়েছিল। শ্যামের সঙ্গে বি আর চোপড়া, যশ চোপড়ারও সখ্য তৈরি হয়। আসলে শ্যাম কখনও নিজের ছবিকে 'প্যারালাল' সিনেমা বলে মনে করেননি। তিনি মনে করতেন, যে-কোনও চিত্রনির্মাতাই দায়বদ্ধ প্রযোজকের প্রতি। বলেছিলেন, 'আমার এসব টার্ম নিয়ে আপত্তি আছে। 'প্যারালাল' বা 'অল্টারনেট' শব্দগুলো যেন কাস্ট সিস্টেমের মতো। অনেক সমালোচক আবার আমার ছবির বিষয়ে ভাল ভাল কথা লেখার পাশে এটাও লিখতেন যে, শ্যামের ছবিটি সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এই ধরনের স্টেটমেন্টের কারণে ডিস্ট্রিবিউটরদের মনেও তো প্রভাব পড়ে। যাদের গল্প আমি বলতাম,



■ 'জুবেদা' ছবিতে দৃশ্য বোঝাচ্ছেন করিশমা কপূর ও মনোজ বাজপেয়ীকে



■ ভারতকে দেখতেন অন্য লেন্সে

ছবিগুলো সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের কাছে না পৌঁছলে আর লাভ কী! অনেকে আবার আমাকে 'মিডল-অফ-দ্য-রোড ফিল্মমেকার' বলতেন। আরে ভাই, আমি রাস্তার মাঝে দাঁড়ালে তো গাড়ি চাপা পড়ে মরব!'

শ্যামের সঙ্গে দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের বরাবর সুসম্পর্ক। কারণ সরকারের ফান্ডিংয়ে বা সুপারিশে তিনি অনেক তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন। সরকারি চাকুরে হিসেবে এফটিআইআই-তে পড়িয়েছেন '৬৬ থেকে '৭৩ সাল অবধি। আটের দশকের শেষের দিকে এফটিআইআই-এর চেয়ারম্যান পদেও আসীন ছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি কোনওদিনই সরকারের সমালোচনা করতে পিছপা হননি। যেমন ইউপিএ সরকার যখন আইআইটি প্রবেশিকা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তার কড়া সমালোচনা

> শ্যাম বলতেন, হিন্দুত্ব সব কিছু গ্রহণ করার কথা বলে। অন্য ধর্মকেও। যারা সবকিছু গ্রহণ করে, তারা হিন্দু। যারা করে না, তারা হিন্দু নয়

করেছিলেন শ্যাম। যে শ্যাম বলতে পারেন, 'হিন্দুত্ব তো সব কিছু গ্রহণ করার কথা বলে। অন্য ধর্মকেও। যারা সবকিছু গ্রহণ করে, তারা হিন্দু। যারা করে না, তারা হিন্দু নয়,' তাকে কিন্তু দক্ষিণপন্থী কেন্দ্রীয় সরকারও উড়িয়ে দিতে পারে না। ২০১৬-তে যখন সেন্সর বোর্ডের মাথা পেহলাজ নিহালনির উপর অনাস্থা আসে, তখন সেন্সর বোর্ডের পরিশোধনের জন্য গঠিত কমিটির মুখিয়া হিসেবে বেছে নেওয়া হয় শ্যামকে। তাঁর ব্যক্তিত্ব, সততা, স্বচ্ছতা এমনই যে, তাঁর মনোনয়ন নিয়ে কোনও সরকারই প্রশ্ন তুলতে পারেনি। জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারে শ্যাম বেনেগল বলেছিলেন, ক্রিকেট বা ফুটবল নয়, তাঁর প্রিয় স্পোর্ট হল স্পেনের বুলফাইট! শ্যামের মতো এক ফিল্মমেকার, নিপাট ভদ্রলোক, যিনি কোনওদিন নিজের ফিল্মমেকিংয়ের সঙ্গে আপস করেননি, বক্সঅফিস বা প্রযোজকদের চাপে, তাঁর প্রিয় খেলা কিনা ষাঁড়ের লড়াই! ঠিক শ্যামের ছবির মতো যেন... সরল ন্যারেটিভ, কিন্তু তার পরতে পরতে যেন চমক। গিমিক নয়, আবিষ্কারের চমক। চেনা সম্পর্কের অচেনা সমীকরণ আবিষ্কারের চমক।



শ্যাম বেনেগালের শেষ জন্মদিনে তাঁর অনুগামীরা

ট্যালেন্ট স্পটার শ্যাম

বলা হয়, আপনার মাহাত্ম্য তখনই প্রকাশ পায় যখন আপনি নতুন প্রতিভা তুলে ধরতে পারেন। এই ক্ষেত্রে শ্যাম বেনেগালের জুড়ি মেলা ভার। নাসিরুদ্দিন শাহ থেকে শবানা আজ়মী, কে নেই সেই লিস্ট? লিখছেন **আসিফ সালাম**

“১৯৭৩ সালে প্রথম বার দেখা হয় শ্যাম বেনেগালের সঙ্গে। উনি তখন ‘অঙ্কুর’এর কাস্টিং করছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই ওঁর উদার, চওড়া হাসি আমাকে প্রভাবিত করেছিল,” শ্যাম বেনেগালের স্মৃতিচারণা এ ভাবেই করেছিলেন শবানা আজ়মী।

সাত-আটের দশকে ভারতীয় সিনেমার ‘প্যারালাল’ বা সমান্তরাল ধারার বেশিরভাগ প্রথিতযশা অভিনেতা-অভিনেত্রীই শ্যাম বেনেগালের সান্নিধ্য পেয়েছেন। শবানা আজ়মী থেকে নাসিরুদ্দিন শাহ, কুলভূষণ খরবন্দা থেকে স্মিতা পাটিল, গিরিশ করনাড থেকে অমরীশ পুরি...তালিকা দীর্ঘ। কারও

অভিনেত্রী শারদার সঙ্গে দেখা করতে চেন্নাই যান তিনি। শারদাও এমন ছকভাঙা সাহসী চরিত্র করতে চাননি। চরিত্রটি ছিল এমন একজন মহিলার, যিনি পরকীয়া ও বিয়ে ব্যতিরিকে হওয়া সন্তান নিয়ে বিন্দুমাত্র আফশোস করেন না। অপর্ণা সেনের কাছেও অফার যায়, তবে তিনি চরিত্রটির জন্য নয়, সন্দিহান ছিলেন অন্ধ্র ডায়লেক্ট বলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে। অঞ্জু মহেন্দ্রও প্রত্যাখ্যান করেন। এক সাক্ষাৎকারে শ্যাম বেনেগাল বলেছিলেন, "আমি ভাবছিলাম এর পরে আর কাকে অ্যাপ্রোচ করব। তখন আমার সহকারী শবানা আজ়মীর নাম বলেন। আমি জানতামও না ওকে। যদিও শবানার বাবা কাইফি আজ়মীর সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছিল। ওর মা শওকত ছিলেন দারুণ থিয়েটার অভিনেত্রী। তবে প্রথম বার সাক্ষাতের পরই বুঝে যাই, এই চরিত্রের



■ ছবির সেটে শ্যামের তিন প্রিয় অভিনেতা স্মিতা, নাসিরুদ্দিন ও গিরীশ

কেরিয়ারের উত্থানের সৌজন্যে ছিলেন বেনেগাল স্বয়ং, কেউ আবার তাঁর মেন্টরশিপ পেয়ে ধন্য।

শবানার গুরু হতে চাননি বেনেগাল

শ্যাম বেনেগালের 'অঙ্কুর', 'নিশান্ত', 'জুনুন', 'সুস্মান', 'অন্তর্নাদ'এর মতো ছবিতে কাজ করেছেন শবানা আজ়মী। শবানার প্রথম পরিচালক তিনি। শুধু প্রথম পরিচালক হিসেবেই নয়, কেরিয়ারে যখনই কোনও সিদ্ধান্ত নিতে সংশয়ে ভুগতেন শবানা, দ্বারস্থ হতেন 'গুরু' শ্যাম বেনেগালের। "উনি নিজেকে কারও গুরু বলে মানতেন না কখনও। কিন্তু তবুও আমি বলব, উনি আমার গুরু ছিলেন। শুধু আমার প্রথম ছবির পরিচালক বলে নন, ওঁর সান্নিধ্যে থেকে আমি জীবন সম্পর্কে অসংখ্য শিক্ষা পেয়েছি। কোন প্রজেক্ট করব, কোনটা করব না, সে ব্যাপারে সব সময় ওঁর পরামর্শ নিতাম। উনি যদিও আমার গুরু বা মেন্টর কোনওটাই হতে চাননি। চেয়েছিলেন বন্ধু হয়ে সমান সম্মান দিতে," এক সাক্ষাৎকারে বলেন শবানা। 'অঙ্কুর' ছিল শবানার প্রথম ছবি। ওই ছবিতেই ডেবিউ করেন অভিনেতা অনন্ত নাগও। সেই ছবির জন্য বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে যান শবানা। সেই ঘটনার কথা মনে করে তিনি বলেন, "আমার বয়স কম। আমি তো বার্লিনে পৌঁছেই শপিং করতে যেতে চাইছিলাম! কিন্তু উনি ট্যাক্সিতে পুরোটা রাস্তা



■ 'নিশান্ত' ছবির শুটে শবানা আজ়মী ও স্মিতা পাটিলের সঙ্গে শ্যাম

ড্রাইভারকে নানা প্রশ্ন করতে করতে গেলেন। জায়গাটির ইতিহাস সম্পর্কে।" শবানার মতে, শ্যাম বেনেগাল ছিলেন 'প্রগ্রেসিভ' ও 'ওয়েল ইনফর্মড' পরিচালক।

ওয়াহিদা থেকে অপর্ণা সেন, সকলে ফিরিয়ে দিলেন অফার

'অঙ্কুর'এ শবানার কাস্টিংয়ের পিছনেও রয়েছে দীর্ঘ গল্প। ছবির জন্য শ্যাম বেনেগালের প্রথম পছন্দ ছিলেন ওয়াহিদা রহমান। গুরু দত্তের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে ওয়াহিদার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল বেনেগালের। কিন্তু পরিচালকের মতে, ওয়াহিদা অতটাও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না চরিত্রটি নিয়ে। তাই তিনি 'না' বলে দেন। এর পর দক্ষিণের

জন্য ও আদর্শ।" একই সময়ে 'নিশান্ত'এর অফারও শবানাকে দেন বেনেগাল। শবানা আজ়মীর মা ভাবেন, এ কেমন পরিচালক, যিনি একটা ছবি না করতেই আর একটার অফার দিচ্ছেন! শেষমেশ শ্যাম বেনেগালই হয়ে ওঠেন শাবানার কেরিয়ারের পথপ্রদর্শক।

দেখতে ভাল না হওয়ায় সুযোগ দিলেন বেনেগাল!

নাসিরুদ্দিন শাহ বেনেগালকে শুধু মেন্টরই মানতেন না, বরং তিনি ছিলেন তাঁর কাছে 'পালক পিতা'র মতো। 'নিশান্ত', 'মন্থন', 'মণ্ডি'র মতো ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেন তাঁরা। শ্যাম বেনেগালের স্মৃতিচারণে

নাসিরুদ্দিন শাহ বলেছিলেন, “আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার সব কৃতিত্ব ওঁর। একটা সময় কেউ আমার উপর ভরসা করেননি। ভাবলে অবাক লাগে, যদি বেনেগাল আমায় ভরসা না করতেন তাহলে আমি আজ কোথায় থাকতাম!” ‘নিশান্ত’এ নাসিরুদ্দিন শাহকে কেন কাস্ট করেছিলেন বেনেগাল? কয়েক বছর আগে অভিনেতা বলেছিলেন, শুধু অভিনয় ক্ষমতার জন্য নয়। বরং, তিনি দেখতে ভাল ছিলেন না বলেই ওই ছবিতে সুযোগ পান! মজার বিষয় হল, নাসিরুদ্দিনের নাম বেনেগালের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন গিরিশ কারনাড। ঘটনাচক্রে সর্বভারতীয় সিনেমায় গিরিশ কারনাডের কেরিয়ারেও দীর্ঘ প্রভাব ফেলেন বেনেগাল। ‘মণ্ডি’তে ৪০জন অভিনেতা একসঙ্গে থাকতেন, টানা ৪০দিন তাঁরা একসঙ্গে শুট করেছিলেন। কিন্তু সেটে কখনও কোনও সমস্যা তৈরি হয়নি, এতটাই নিপুণ নিয়ন্ত্রণ থাকত বেনেগালের হাতে। ‘মণ্ডি’তে শবানার চরিত্র ছিল নিষিদ্ধপল্লির রুক্মিণী বাঈয়ের। প্রথমে একটু ইতস্তত করলেও শেষমেশ রাজি হন শবানা। এই ছবিতেই অনবদ্য ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল নাসিরুদ্দিন শাহকেও। ‘জুনুন’ বা ‘নিশান্ত’ নাসিরুদ্দিনকে অভিনেতা হিসেবে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। “মন্থন আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছবি। সে সময়ে আমি মেথড অ্যাক্টিং করতাম। কিন্তু এই ছবি আমার সেই অভ্যেসকে সারিয়ে তোলে। গুজরাতি মিল্ক ফার্মারের চরিত্র করা একেবারেই সহজ ছিল না আমার কাছে। কিন্তু এই ছবি শুধু মিল্ক কোঅপারেটিভ মুভমেন্টের



■ স্মিতা পাটিলের অভিভাবকের মতো ছিলেন শ্যাম



■ শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত ‘অর্ধ সত্য’ ছবির সেটে ওম পুরি, শবানা ও অমরীশ পুরি

‘ভূমিকা’র সেটে স্মিতাকে চড় মেরেছিলেন অমোল পালেকর, তাও আবার অভিনেত্রীকে না জানিয়ে। শট দেওয়ার পর রেগে আগুন স্মিতা! কিন্তু এসবই নাকি হয়েছিল পরিচালকের নির্দেশে। আসলে তিনি চেয়েছিলেন...

জন্য লাভজনক ছিল না, বক্স অফিসেও বড় হিট ছিল,” এক সাক্ষাৎকারে বলেন নাসিরুদ্দিন।

স্মিতা ছিলেন বেনেগালের মিউজ়

নতুন অভিনেতাদের খুঁজে এনে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে শ্যাম বেনেগাল ছিলেন এগিয়ে। তাঁর পরিচালিত ‘নিশান্ত’এর কথাই ধরুন। একটি ছবিতে নাসিরুদ্দিন শাহ, স্মিতা পাটিল, শবানা আজ়মী, গিরিশ কারনাড, অমরীশ পুরি...সকলে ছিলেন। ঘটনাচক্রে প্রত্যেকেই ভারতীয় সিনেমায় নিজস্বতার দীর্ঘ ছাপ রেখে যান। স্মিতা পাটিল ছিলেন শ্যাম বেনেগালের ‘মিউজ়’। স্মিতার মৃত্যুর পর স্মৃতিচারণায় পরিচালক বলেছিলেন, “স্মিতা নিজেকে কখনও তারকা হিসেবে ভাবতই না। সেটে কখনও লাইট সরাচ্ছে, কখনও কাউকে জল এনে দিচ্ছে...খুবই সাধারণ জীবনযাপন ছিল। কিন্তু চিন্তাভাবনার দিক থেকে স্বাধীনচেতা ছিল। বলা যায়, নিজের মতো করে একজন ‘রেবেল’। অসম্ভব নিষ্ঠাবান একজন অভিনেত্রী ছিল। পরিচালকের প্রতি নিজেকে পুরো সমর্পণ করে দিতে জানত।”

‘মণ্ডি’, ‘ভূমিকা’, ‘নিশান্ত’, ‘মন্থন’এর মতো বহু ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা। ‘মন্থন’এর সময়ে স্মিতার বয়স ছিল ২০। প্রশিক্ষিত অভিনেত্রীও ছিলেন না তিনি তখন। কিন্তু বেনেগাল ভরসা রেখেছিলেন স্মিতার প্রতিভার উপরে। আর সেই ভরসার সম্মান অভিনেত্রী দিয়েছিলেন বরাবর।

স্মিতাকে পরিচালকের নির্দেশে চড় মারলেন অমোল পালেকর

‘ভূমিকা’র সেটে স্মিতাকে চড় মেরেছিলেন অমোল পালেকর, তাও আবার অভিনেত্রীকে না জানিয়ে। শট দেওয়ার পর রেগে আগুন স্মিতা! কিন্তু এসবই নাকি হয়েছিল পরিচালকের নির্দেশে। তিনিই অমোলকে বলেন, অভিনেত্রীকে কিচ্ছু না জানিয়ে এরকম চড় মারতে হবে। অমোল পালেকর প্রথমে

করতে অস্বীকার করেন। রিহার্সাল ছাড়া এমনিতেই তিনি কোনও দৃশ্য করেন না, তার উপর মহিলার গায়ে তাঁকে না জানিয়ে হাত তোলা! আসলে পুরোটাই ছিল অভিনেতাদের আসল অভিব্যক্তিকে ক্যামেরাবন্দি করার জন্য। "স্মিতার গায়ে হাত তোলার পর ওর অভিব্যক্তিই বদলে যায়। আর ক্যামেরায় পুরোটা ধরা হয়। এমনকি, আমিও অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম," পরে বলেন অমোল পালেকর। অভিনেতাদের থেকে সেরাটা বার করে আনতে জানতেন বেনেগাল। ঠিক এ কারণেই বোধহয় 'মন্থন'এর সেটে গুজরাতের অসম্ভব গরমে নাসিরুদ্দিন শাহ, স্মিতা পাটিল, গিরিশ করনাড ও অমরীশ পুরিকে তিনি একই পোশাক পরিয়ে ৪০-৪৫ দিন শুট করান! আসলে ওই অঞ্চলের জলের অভাবের কারণে সাধারণ মানুষ স্নান করতেন না প্রায়ই। সেই অনুভূতিটাই সিনেমায় রাখতে চেয়েছিলেন পরিচালক।

দীপ্তি নাভালকে প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড় করালেন

আরও এক অভিনেত্রী বেনেগালকে মেন্টর হিসেবে পেয়েছিলেন। তিনি হলেন দীপ্তি নাভাল। নিউ ইয়র্কে পড়ার সময় থেকেই বেনেগালের কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন দীপ্তি। 'অঙ্কুর', 'নিশান্ত', 'ভূমিকা' দেখে ফেলেছিলেন তখনই। এমনকি, নিউ ইয়র্কে স্মিতা পাটিলের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বও হয়ে যায় দীপ্তির। মুম্বইতে এসে বেনেগালই প্রথম পরিচালক যাঁর সঙ্গে দেখা করেন দীপ্তি। "আমি ওঁকে বলি, আমি অভিনেত্রী হতে চাই। আর আমার প্রথম ছবি আপনার সঙ্গেই করতে চই। সে সময়ে উনি 'জুনুন' বানাচ্ছিলেন। আমি প্রশিক্ষিত অভিনেত্রী ছিলাম না একদমই। আর 'জুনুন'-এর কাস্টিংও হয়ে গিয়েছিল। লখনউতে ছবির শুটিং চলার সময়ে আমি একটা ফোন পাই। ছোট্ট চরিত্রের অফার দেওয়া হয় আমাকে। আমি তো খুশিতে ডগমগ! নাসিরুদ্দিন শাহ, শবানা আজ়মী, জেনিফার কপূর, শশী কপূরদের সঙ্গে দেখা হবে ভেবে উল্লসিত আমি। শ্যামবাবু অসম্ভব নম্র, ভদ্র ও শিক্ষিত একজন মানুষ ছিলেন। 'জুনুন'-এর পর খুব বেশি কাজ হয়নি ওঁর সঙ্গে। কিন্তু উনিই প্রথম মানুষ যিনি আমাকে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করান," বলেন দীপ্তি।



■ শ্যাম বেনেগালের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে নাসিরুদ্দিন শাহ এবং ওম পুরি



■ শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত 'অঙ্কুর' ছবিটি তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম প্রশংসিত ছবি

তারকা তৈরির কারিগর

শুধু এঁরাই নন, কুলভূষণ খরবান্দা থেকে ওম পুরি, মোহন আগাসে থেকে দিব্যা দত্ত... সকলের জীবনে ও কেরিয়ারেই উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল বেনেগালের। কুলভূষণ খরবান্দা পরিচালকের 'নিশান্ত', 'মন্থন', 'ভূমিকা', 'জুনুন', 'কলিযুগ'এর মতো ছবিতে কাজ করেছিলেন। ওম পুরির সঙ্গেও শ্যাম বেনেগালের সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের মতো ছিল। ওম পুরি বেনেগালকে এনসাইক্লোপিডিয়া বলতেন। বেনেগালের মৃত্যুর পর ওম পুরির স্ত্রী নন্দিতা পুরি বলেছিলেন, "বেনেগাল ওম পুরির মেন্টর-সম ছিলেন। আর আমাদের কাছে পরিবার। খাবার, ঘোরার জায়গা থেকে যে কোনও বিষয়ে যা কিছু তথ্য লাগত, আমরা ওঁকে জিজ্ঞেস করতাম। আমাদের ছেলে ঈশানেরও খুব কাছের ছিলেন উনি।" দিব্যা দত্ত ১৭-১৮ বছর বয়সে প্রথম বেনেগালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বেনেগালের 'সমর' ছবিতে কাজও করেন তিনি। সেটে এতটাই বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ ছিল, যা মুগ্ধ করে দিব্যাকে। "আমাকে উনি একটি ফোক সং কোরিয়োগ্রাফ করারও অনুমতি দেন," জানিয়েছিলেন দিব্যা। মোহন আগাসের কেরিয়ারেও বড় ভূমিকা ছিল শ্যাম বেনেগালের।

শ্যাম বেনেগালের মতো স্টলওয়ার্টদের জন্যই আজ বলিউডে এত প্রতিভার ছড়াছড়ি। বেনেগাল হয়তো আর নেই, কিন্তু তাঁর খুঁজে পাওয়া প্রতিভাদের মধ্যে দিয়েই তিনি আমাদের মধ্যে 'জীবন্ত' হয়েই থাকবেন।

তারা উবাচ

শ্যাম বেনেগলের প্রয়াণে নিজেদের মতো করে শ্রদ্ধা জানালেন তারকারা। কী বললেন তাঁরা? দেখে নেওয়া যাক...

তাঁর ছবি একাধারে তুলে ধরত ভারতবর্ষের মূল সমস্যাগুলিকে, তেমনই সেই ছবিতে থাকত বিনোদনও। তাইতো তাঁর ছবি কোনও সময়ের ফসল হিসেবে থাকবে না। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনকে কুর্নিশ জানান তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখা তারকারা। পরিচালকের প্রয়াণের পর সেই সব স্মৃতিই তুলে ধরলেন রুপোলি পর্দার তারকারা...



একটা যুগের শেষ হল। শ্যাম বেনেগলের ছবি শুধু কোনও সময়ের ফসল হিসেবে থাকবে না, কালোত্তীর্ণ হয়ে থেকে যাবে। কারণ তিনি ছবিতে সময়ের বাইরে গিয়ে কথা বলেছেন। আমার খারাপ লাগছে যে, ওঁর শেষ জন্মদিনে থাকতে পারলাম না। তা হলে অন্তত শেষ দেখাটা হত।

নন্দিতা দাস



উনি শুধু আমার গুরু ছিলেন না, আমার 'পৃথিবী' ছিলেন। আমার অভিনয় শুধু নয়, পৃথিবীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী অবধি পালটে দিয়েছিলেন। মনে আছে, আমি ওঁর সঙ্গে বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিলাম 'অঙ্কুর' ছবিটির প্রদর্শনের জন্য। আমার বয়স তখন এত কম যে, আমি সারাক্ষণ শপিং করতে চাইতাম। কিন্তু ওঁকে দেখেছিলাম ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে অবধি সেখানকার ইতিহাস এবং স্থানীয়



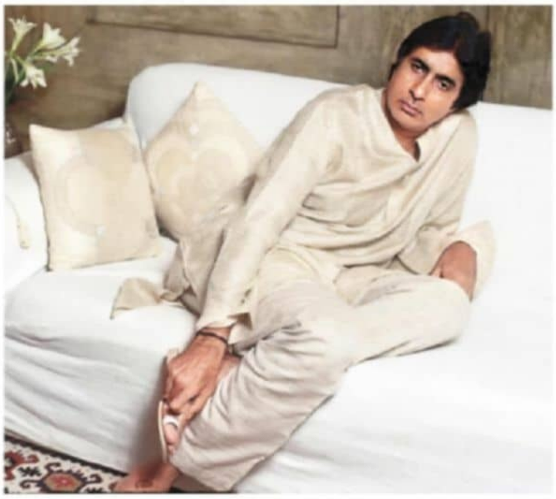
বাগান নিয়ে কথা বলছেন। ওঁর অনুসন্ধিৎসু মনকে কুর্নিশ জানাই।

শবানা আজ়মী

তিনি ভারতীয় সিনেমার সেই বিরলতম পরিচালক, যিনি আমার চেহারার বাইরে গিয়ে অভিনয়সত্তাকে দেখতে পেয়েছিলেন। আমি নিজে বুঝতে পারিনি, কিন্তু শ্যাম বেনেগল বলেছিলেন, মনোজ বাজপেয়ীর মতো অভিনেতাই করবেন 'জুবেইদা'র মতো ছবি। আমি ওই দিনটার জন্য সত্যিই কৃতজ্ঞ।

মনোজ বাজপেয়ী





একটা যুগের শেষ হল। শ্যাম বেনেগলের ছবি সাধারণ মানুষের মনে থেকে যাবে। আমার প্রার্থনা এবং শ্রদ্ধা রইল এই গুণী মানুষটির প্রতি।

অমিতাভ বচ্চন





শ্যাম বেনেগল সেই বিরলতম মানবিক পরিচালক, যিনি আদত ভারতবর্ষকে সিলভার স্ক্রিনে তুলে এনেছিলেন। উনি আমার গুরুর মতো। আমরা সেই ছবি দেখে বিনোদন যেমন পেয়েছি, তেমন বুঝেছি ভারতবর্ষের মূল সমস্যাগুলো ঠিক কোথায়।

কমল হসন

উনি শুধু আমার কেরিয়ারে নয়, ভারতীয় সিনেমায় অতি উল্লেখযোগ্য প্রভাব রেখছেন। উনি যদি আমাকে সুযোগ না দিতেন, তা হলে 'মান্ডি' হয়তো হত, কিন্তু আমি কোনও জায়গায় থাকতাম না। উনি মুম্বই সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি থেকেই যাবতীয় প্রতিভা তুলে এনেছেন। আমি ওঁর প্রতি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ।

অন্নু কপূর



■ ‘জুনুন’-এর সেটে দীপ্তির সঙ্গে শ্যাম

বলেছিলেন, আমার দাঁত খুব সুন্দর

শ্যাম বেনেগাল তাঁর কাছে ‘ফিল্ম স্কুল’। প্রিয় পরিচালককে নিয়ে লিখছেন **দীপ্তি নভল**।

ছয়ের দশকের শেষের দিকে অমৃতসরে ছাত্রদের একাংশ খুব উগ্র হয়ে ওঠে। হিন্দু কলেজে বাবার এক কলিগকে ছাত্ররা জুতোর মালা পরিয়েছিল কম নম্বর দেওয়ার জন্য। বাবা তখন ঠিক করলেন, এখানে আর পড়াবে না। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের চাকরি নিয়ে বাবা প্রথমে চলে গেলেন। একবছর পর মা, আমি, দিদি আর ভাই-ও সেখানে চলে যাই। আমি দেখলাম, আমার সিনেমার স্বপ্ন থেকে অনেকটাই দূরে চলে যাচ্ছি। ওখানে হান্টার কলেজে আর্টস নিয়ে ভর্তি হই। অ্যাবনরম্যাল সাইকোলজি, ইংরেজি, অ্যাস্ট্রেনমি... অনেক বিষয় নিয়ে ওখানে পড়ার সুযোগ ছিল। তখন আমি রেডিয়োতে পার্টটাইম কাজ করা শুরু করি। হিন্দি ছবির যেসব অভিনেতারা নিউ ইয়র্ক যেতেন, রাজ কপূর, শশী কপূর, হেমন্তকুমার... আমি যেতাম তাঁদের ইন্টারভিউ নিতে। কলেজ পাশ করার পর আমি প্রথম বাড়িতে জানাই যে আমি অভিনয় করতে চাই। ওঁরা তো আকাশ থেকে পড়ল! কিন্তু সাপোর্টও করেছিল। বম্বে আসি আমি। আমার কাছে একটা লিস্ট ছিল, যে কোন-কোন পরিচালকের সঙ্গে আমি কাজ করতে চাই। সেই লিস্টের একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গেই কাজ করা হয়নি আমার। হেমন্তদার মেয়ে রাণু মুখার্জি

আমার খুব ভাল বন্ধু হয়ে যায়। ওর সূত্রেই আমি হৃষীকেষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করি, তারপর ধীরে-ধীরে বাসু চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম বেনেগল... শ্যামবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আমি ওঁকে বলি, 'আপনার ছবি আমার খুব ভাল লাগে, আমি আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই।' তখন শ্যামবাবু 'জুনুন' (১৯৭৯) বানাচ্ছিলেন। ছবির কাস্টিংও হয়ে গিয়েছিল। লখনউ থেকে ফোন করে তিনি আমাকে বলেন, 'একটা ছোট রোল আছে ছবিতে। তবে তোমাকে স্ক্রিন টেস্ট দিতে হবে, কারণ তুমি অ্যাকটিং শেখোনি কোনওদিন।' তখন উনি একটা অ্যাড ফিল্ম করান আমাকে দিয়ে। সেটাই ছিল আমার স্ক্রিন টেস্ট। আমার জীবনের প্রথম অ্যাডফিল্ম ছিল একটি টুথপেস্টের ব্র্যান্ডের জন্য। কারণ শ্যামবাবুর মনে হয়েছিল, আমার দাঁত খুব সুন্দর।
তারপর 'জুনুন'-এ একটি ছোট রোল উনি আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার সবচেয়ে বড় সুবিধে হল, তুমি অভিনয় শেখোনি।'
শ্যামবাবুর ছবিতে আমার আর কাজ করা হয়নি ঠিকই। তবে অন্য ক্ষেত্রে হয়েছে। ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নীতি নিয়েছিল যে আইআইটি-র বিশেষ প্রবেশিকা তুলে দিয়ে অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে আইআইটি ব্র্যান্ডের মধ্যে



শ্যামের বানানো বিজ্ঞাপনে দীপ্তি



শ্যামের ছবির সূত্রেই শবানার সঙ্গে বন্ধুত্ব দীপ্তির

জানতাম আমার সিন ও সংলাপ কম। কিন্তু সত্যি বলতে কী, 'জুনুন'-এর সেট আমার প্রথম ফিল্ম স্কুল। আর শ্যামবাবু প্রথম শিক্ষক



'জুনুন' ছবির সেটে ছিল দীপ্তির কাছে তাঁর প্রথম ফিল্ম স্কুল। এখানেই প্রথম কাজ করেন শবানা আজ়মী, শশী কপূর, জেনিফার কপূরদের সঙ্গে

করতে বলেন। জানতাম, আমার সিন কম, সংলাপও নেই তেমন। কিন্তু কীভাবে সিনেমা তৈরি হয়, নাসিরউদ্দিন শাহ, শবানা, শশী কপূর, জেনিফার কপূর, এঁদের সঙ্গে কাজ করতে পারব ভেবে আমি কাজটা করি। সত্যি বলতে কী, 'জুনুন'-এর সেট আমার প্রথম ফিল্ম স্কুল।

অ্যাফিলিয়েশন দিয়ে নিয়ে আসবে। শ্যামবাবু এবং আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম। অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ তো কখনও এভাবে লঘু করেনি নিজের মান। তবে আইআইটি-র মতো প্রিমিয়াম ইনস্টিটিউট তা করবে কেন! শ্যামবাবু বলেছিলেন, নিজেদের মান উন্নত করার পরিবর্তে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার মান নামিয়ে আনা অনুচিত। জীবনেও এই দর্শনেই বিশ্বাস করতেন তিনি। তাই নিজের ভিশনের সঙ্গে কোনওদিন কমপ্রোমাইজ় করেননি।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: অংশুমিত্রা দত্ত

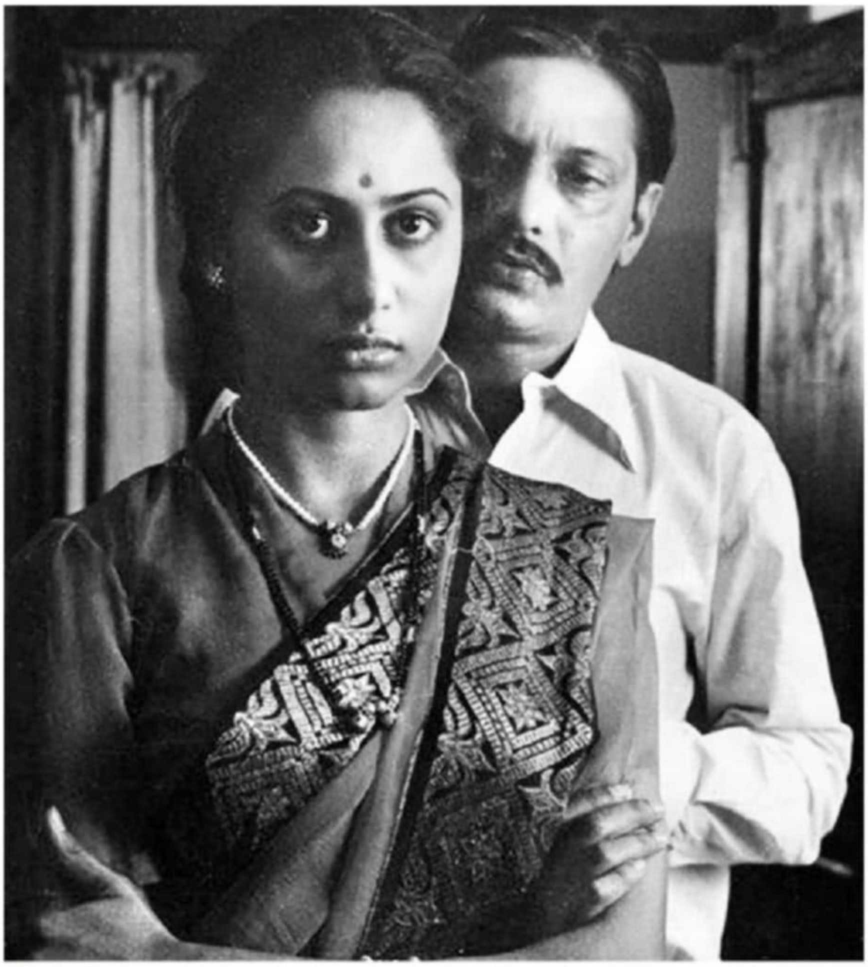


■ সেটে অমোলকে শট বোঝাচ্ছেন শ্যাম বেনেগল

শ্যাম স্যারের জন্য স্মিতাজিকে চড় মারতে হয়েছিল

তাঁর অভিভাবক এবং মেন্টর **শ্যাম বেনেগল**কে নিয়ে স্মৃতিচারণা করলেন **অমোল পালেকর**

আপনার জীবনে কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের অবদান ভোলার নয়। তাঁরা হয়তো রক্তের সম্পর্কে আপনার কেউ হন না, কিন্তু তাঁরা আপনার জীবন আমূল বদলে দেন। আমার জীবনে এরকমই একটি মানুষের নাম শ্যাম বেনেগল। ওঁর কাছ থেকে কত কিছু যে শিখেছি তার হিসেব নেই। শুধু শেখা নয়, কেরিয়ারে যখনই কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সংশয় হয়েছে, সবসময় শ্যাম স্যারকে পাশে পেয়েছি। ওঁর জীবনদর্শনও ছিল অসামান্য। এত বড় মাপের একজন মানুষ, কিন্তু জীবনটাকে কত সহজভাবে দেখতেন। শ্যাম বেনেগলের সঙ্গে কাজের কথা বললে, প্রথমেই মনে পড়ে যায় 'ভূমিকা' ছবিতে শ্যাম স্যারের নির্দেশে স্মিতা পাটিলকে সেই চড় মারার দৃশ্যটির কথা। বিশ্বাস করুন, আমি প্রথমে ওই দৃশ্যটা করতে চাইনি। এমনিতে স্মিতাজি খুব সিরিয়াস স্বভাবের ছিলেন। আমার সঙ্গে খুব বিশেষ সখ্যও ছিল না। তার উপর শ্যাম স্যারের কড়া নির্দেশ ছিল, স্মিতাজিকে কিছু না জানিয়েই এই চড় মারার দৃশ্যটি করতে হবে। স্যারের উদ্দেশ্য ছিল স্মিতাজির মুখে যেন ওই আচমকা ভাবটা ফুটে ওঠে। কিন্তু আমি বেনেগল স্যারকে স্পষ্ট বলি, এই সিনটা আমি করতে পারব না। অন্তত স্মিতাজিকে জানিয়ে শটটা নেওয়া হোক। হঠাৎ করে কিছু না বলে একজন মহিলার গায়ে হাত তুলব! স্যার তখন আমাকে অভিনয় সংক্রান্ত কিছু টিপস দেন যেটা আমি কোনওদিনও ভুলব না। আর স্যারের টিপস শুনে আমিও আশ্বস্ত হই যে আমি ভুল কিছু করছি না। মনে আছে, দৃশ্যটির পর স্মিতাজি কিন্তু নিজে থেকে এসে আমার প্রশংসা করেছিলেন! যদিও অল ক্রেডিট গোজ় টু শ্যাম স্যার। পরবর্তীকালে 'তরঙ্গ' বলে একটি ছবির জন্য পরিচালক কুমার সাহানি স্মিতা পাটিলের



'ভূমিকা' ছবির দৃশ্যে স্মিতার সঙ্গে অমোল



অমোল পালেকর

বিপরীতে একজন নায়ক খুঁজছিলেন। সাহানি সাহেব আবার শ্যাম স্যরকে খুব মানতেন। শ্যাম স্যরই সাহানি সাহেবকে আমার কথা বলেন। এরকম আরও একাধিক ছবিতে শ্যাম স্যর আমাকে রেফার করেছেন। তবে শুধু কেরিয়ার



'তরঙ্গ' ছবির দৃশ্য

জীবনে একটা সময় এসেছিল যখন ব্যক্তিগত কিছু বিষয় নিয়ে আমি খুব চিন্তিত ছিলাম। কিছুটা দিশাহারা হয়ে পড়ি। সেই সময় শ্যাম স্যর আমাকে রেসকিউ করেন

সংক্রান্ত পরামর্শই নয়, শ্যাম বেনেগল ওয়াজ় আ ফাদার লাইক ফিগার ফর মি। জীবনে একটা সময় এসেছিল যখন ব্যক্তিগত কিছু বিষয় নিয়ে আমি খুব চিন্তিত ছিলাম। কিছুটা দিশাহারা হয়ে পড়ি। সেই সময় শ্যাম স্যর আমাকে রেসকিউ করেন। ওঁর অমূল্য উপদেশ আমার সমস্ত সমস্যার অবসান ঘটায়। স্যরের সেই অবদানের কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না। স্যর যেদিন চলে গেলেন সেদিন মনে হয়েছিল মাথার উপর থেকে ছাদটা যেন সরে গেল। অনেক বয়সকালেও আমাদের একেবারে বাচ্চার মতো আগলে রাখতেন। উনি আমার পরিবারের সদস্যর মতোই হয়ে গিয়েছিলেন।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: আসিফ সালাম

স্মরণে শ্যাম

তিনি ছবি তৈরি করতেন। তৈরি করতেন স্মৃতির মুহূর্ত। তবে নিজে যখন ছবির অংশ হয়েছেন, তখনও তার গুরুত্ব অপরিসীম। শ্যাম বেনেগলকে শ্রদ্ধা জানানো হল ছবিতে।



সত্যজিৎ ও মৃণাল সেনের সঙ্গে



'নেতাজী'র স্মরণে একটি অনুষ্ঠানে শচীন খেদেকরের সঙ্গে



পছন্দের দই নায়িকা স্মিতা পাটিল ও শবানা আজ়মী



ছোট্ট শ্যামের সাঁতারু অবতার

সত্যজিৎ রায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শ্যাম। তাঁকে ঈর্ষা করতেনও বলা যায়। তাঁর মতে ভারতীয় সিনেমার দু'টি যুগ। সত্যজিৎ পূর্ব এবং সত্যজিৎ উত্তর

ছবি পরিচালক না হলে কী হতেন শ্যাম বেনেগল? অনেকেই বলেন ভাল গল্প লিখতে পারতেন তিনি। অনেকেই মনে করেন অভিনয়ও করতে পারতেন। কিন্তু শ্যাম সাঁতারের চেয়ে আর কিছুকেই খুব বেশি ভালবাসেননি। তিনি সাঁতারু হতেন।



■ জৈল সিংহের কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন



■ গুলজারের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে



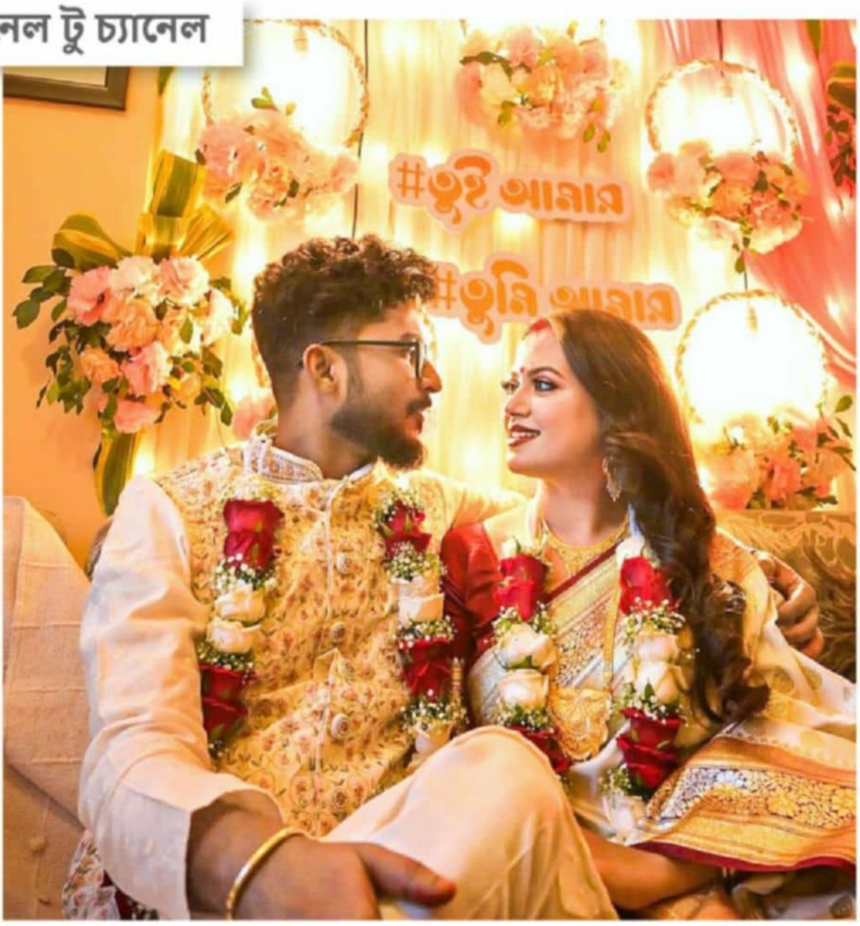
■ শুটিংয়ের সময় ছিলেন একেবারে অন্য মানুষ



■ ভক্তদের মাঝে



■ শশী কপূর এবং সুপ্রিয়া পাঠকের প্রিয় মানুষ



অহনার বিয়ের মুহূর্ত

বিয়ের এক বছর

বিয়ের এক বছর পার করলেন অভিনেত্রী অহনা দত্ত। বাংলা টেলিভিশনে 'মিশকা' নামেই জনপ্রিয় তিনি। 'অনুরাগের ছোঁয়া' ধারাবাহিক থেকে তাঁর জনপ্রিয়তা পৌঁছায় তুঙ্গে। রাজ চক্রবর্তীর 'সন্তান' ছবিটি দিয়ে সদ্য বড়পর্দায় ডেবিউ করেছেন অহনা। দীর্ঘ এক বছরে প্রকাশ্যে আনেননি বিয়ের খবর। কিন্তু টলিপাড়ায় কানাঘুষোয় সকলেই জানতেন মনের মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে থাকেন তিনি। সেটাও মায়ের অমতে। মেকআপ আর্টিস্ট দীপঙ্করকে কখনওই পছন্দ ছিল না অহনার মায়ের। কারণ দীপঙ্করের ছিল এটা দ্বিতীয় বিয়ে। অহনা শোনেননি মায়ের কথা। এ বার প্রকাশ্যে আনলেন বিয়ের ছবি। প্রমাণিত হল, লিভ ইন নয়, এক বছর আগে আইনি মতে বিয়ে সেরেছিলেন তাঁরা। অহনা লিখেছেন, "৬৫০ বর্গফুটের এই ছোট্ট ফ্ল্যাটেই বসেছিল আমাদের বিয়ের আসর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আমার শ্বশুরবাড়ির সকলে।" বিয়ের এক বছর পর সেই ছবি প্রকাশ্যে আনলেন অভিনেত্রী। তিনি জানিয়েছেন, হয়তো তাঁর মাও এই ছবির মাধ্যমেই জানতে পারলেন, এক বছর আগে তাঁর মেয়ে বিয়ে করেছেন।

জুটিতে জিতু-দিতিপ্রিয়া

টেলিভিশনে নতুন জুটি কিন্তু পুরনো চেনা মুখ। প্রায় তিন বছর পর টেলিভিশনের পর্দায় ফিরছেন দিতিপ্রিয়া রায়। এ দিকে জিতু কমলকে বিগত পাঁচ বছর আগে দেখা গিয়েছিল বাংলা ধারাবাহিকে। 'রাণী রাসমণি'র পর দিতিপ্রিয়া মন দিয়েছিলেন সিনেমা এবং ওয়েব সিরিজ়ে। এখনও ছবির কাজেই ব্যস্ত তিনি। এ দিকে 'অপরাজিত' ছবি থেকে জিতুর জনপ্রিয়তা পৌঁছায় তুঙ্গে। দীর্ঘদিন টেলিভিশনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না তাঁর। চলতি বছরে তাঁকে দেখা গিয়েছে 'পদাতিক', 'অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ'-এর মতো একাধিক জনপ্রিয় ছবিতে। ধারাবাহিকে আসা নিয়ে এখনই কিছু জানাতে চান না তিনি। শোনা গিয়েছে, এই ধারাবাহিকের জন্য মোটা টাকার পারিশ্রমিক পাবেন জিতু। তবে দিতিপ্রিয়া অনেকদিন থেকেই বেশ কিছু ধারাবাহিকে অভিনয়ের প্রস্তাব পাচ্ছিলেন। অপেক্ষায় ছিলেন ভাল গল্পের। এ বার অসমবয়সী প্রেমের গল্পে দেখা যাবে তাঁদের দু'জনকে। ধারাবাহিকের নাম 'তোমাকে ভালবেসে'। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ধারাবাহিকের প্রোমো। যেখানে দেখা গিয়েছে হাওয়ার চেয়েও দ্রুত গতিতে সাইকেল চালাচ্ছেন দিতিপ্রিয়া। তবে জিতুর চরিত্রের লুক এখনও সামনে আসেনি। ধারাবাহিকের শুটিং শুরু হয়েছে কিন্তু কবে থেকে সম্প্রচারিত হবে তা জানা যায়নি।



জিতু কমল এবং দিতিপ্রিয়া রায়



■ অর্জুন চক্রবর্তী

হিন্দি ধারাবাহিকে অর্জুন

হিন্দি ধারাবাহিকে পা রাখতে চলেছেন অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী। ধারাবাহিক দিয়েই পথ চলা শুরু তাঁর। ছবি, সিরিজ় মিলিয়ে এখন তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। এবার হিন্দি ভৌতিক ধারাবাহিকে দেখা যাবে তাঁকে। তাঁর বিপরীতে থাকবেন শ্রুতি বিস্ত। হিন্দি টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ শ্রুতি। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ধারাবাহিকের প্রথম ঝলক। ধারাবাহিকের নাম 'চেতকি'। সেখানে অবশ্য অর্জুনকে দেখা যায়নি। তবে তিনি যে এই ধারাবাহিকে থাকবেন তা নিশ্চিত। ধারাবাহিকের পাশাপাশি চলতি বছরে বেশ কিছু বড় বাজেটের ছবিতেও দেখা মিলবে অর্জুনের। যাঁর মধ্যে অন্যতম 'দেবী চৌধুরানী' এবং 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই।'

নতুন নাকি পুরনো?

নতুন কাজে অভিকা মালাকার। তবে তা নতুন ঠিক নয়। 'তোমাদের রাণী' ধারাবাহিকের মাধ্যমে টেলিভিশনের পর্দায় পা রাখেন অভিকা। স্কুল পড়ুয়া অভিকা, মায়ের চরিত্রে অভিনয় করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন টেলিভিশনে। তাই সেই ধারাবাহিকের হিন্দি রিমেকে আবারও দেখা যাবে অভিকাকেই। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ছবির প্রোমো। সেই একই রকম দক্ষ অভিনয় তাঁর। হিন্দিতেও সাবলীল তিনি। তবে তাঁর বিপরীতে অর্কপ্রভ নয়, রয়েছেন হিন্দি ধারাবাহিকের জনপ্রিয় অভিনেতা ফরমান হায়দর। ধারাবাহিকের নাম 'পকেট মে আসমান'। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সুশান্ত দাস এবং বিনোদ রাউতেলা। যৌথ প্রযোজনা সংস্থার দায়িত্বে থাকা এই ধারাবাহিকটি খুব শীঘ্রই সম্প্রচারিত হবে। অভিকা নিজেও তাঁর অনুরাগীদের উদ্দেশে জানিয়েছেন, তিনি আবার কাজে ফিরছেন। আপাতত কাজের জন্য মুম্বইতেই আছেন তিনি। শুটিং সেখানেই হবে। এছাড়া ধারাবাহিকের বেশ কিছু আউটডোর শুট হবে আমেদাবাদে।



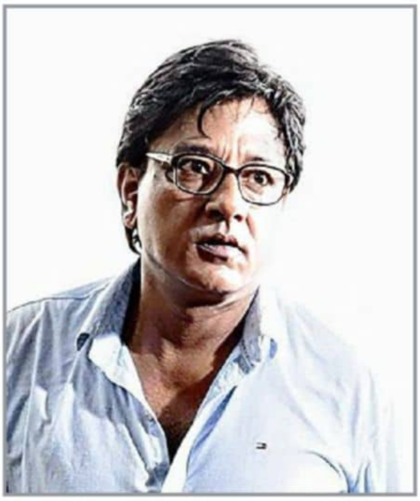
■ অভীকা মালাকার

সফর নিয়ে চর্চা

সদ্য গোয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন 'দ্বিতীয় বসন্ত'র নায়িকা সোহিনী গুহ রায়। সেই নিয়ে জোরকদমে চলছে চর্চা। বিকিনি পরতেই নেট নাগরিকদের রোষানলের মুখে তিনি। কেন এত সাহসী পোশার পরেছেন সোহিনী? এর আগে মলদ্বীপ ভ্রমণে গিয়েও বিকিন পরার কারণে ট্রোলের মুখে পড়তে হয় সোহিনীকে। সে সময় মুখ খোলেননি অভিনেত্রী। এবার ট্রোলের জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন তিনি। সাউথ গোয়া থেকে ফিরতেই নিন্দুকদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রশ্ন, "আমি তো বুঝতেই পারছি না সমুদ্র সৈকতে কী পরা উচিত?" তবে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, প্রতিবারই এরকম পোশাক পরবেন। সমুদ্রে গিয়ে অন্তত শাড়ি পরবেন না। ওটা শাড়ি পরার জায়গা নয়।



■ সোহিনী গুহ রায়



অরুণ রায়

প্রয়াত পরিচালক অরুণ রায়

প্রয়াত হলেন পরিচালক অরুণ রায়। গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন পরিচালক। সেই অবস্থাতেই তাঁর ছবি 'বাঘাযতীন' রিলিজ় করে। কিন্তু গত কয়েক দিনের অবস্থার অবনতি হওয়ায় আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। বিগত কয়েকদিন ধরে ভেন্টিলেশনে ছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। 'এগারো', 'হীরালাল'-এর মতো জনপ্রিয় ছবি পরিচালনা করেছিলেন তিনি। এমনিতে পরিবার বলতে তাঁর কেউ ছিল না, কিন্তু অরুণের শেষকৃত্যে গোটা সময়টা উপস্থিত ছিলেন দেব, রুক্মিণী, কিঞ্জল নন্দ সহ বাকি শিল্পীরা। হাসপাতাল থেকে প্রথমে তাঁর দেহ তাঁর হরিদেবপুরের বাসভবনে এবং তারপর টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে নিয়ে আসা হয়। শ্রদ্ধা জানাতে আসেন বিনোদন জদতের সহকর্মীরা।

জুটিতে বিক্রম-দেবলীনা

যৌথ পরিবার এবং বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি নিয়ে পরিচালক তথাগত মুখোপাধ্যায়ের আগামী ছবি 'রাস'। হারিয়ে যাওয়া বাঙালি যৌথ পরিবারের এই গল্প আদতে পরিচালকের ছোটবেলার স্মৃতিকথা। এই ছবিতে প্রথম বার জুটি বাঁধবেন দেবলীনা কুমার এবং বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া প্রায় ৩২ জন অভিনেতাকে নিয়ে তৈরি পারিবারিক গল্পের ছবি 'রাস'। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রের প্রথম লুক এবং ছবির পোস্টার। যেখানে একেবারে সাদামাটা পোশাকে ধরা দিয়েছেন বিক্রমসহ অন্যান্য অভিনেতা। এই ছবিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে অনির্বাণ চক্রবর্তী, অর্ণ মুখোপাধ্যায়, পারিজাত চৌধুরী, অনসূয়া মজুমদার, রণজয় বিষ্ণু প্রমুখকে। হয়তো এই বছরই মুক্তি পাবে 'রাস' ছবিটি।



বিক্রম-দেবলীনা



রুক্মিণী মৈত্র

'খাদান'-এর টিকিট পাচ্ছেন না রুক্মিণী!

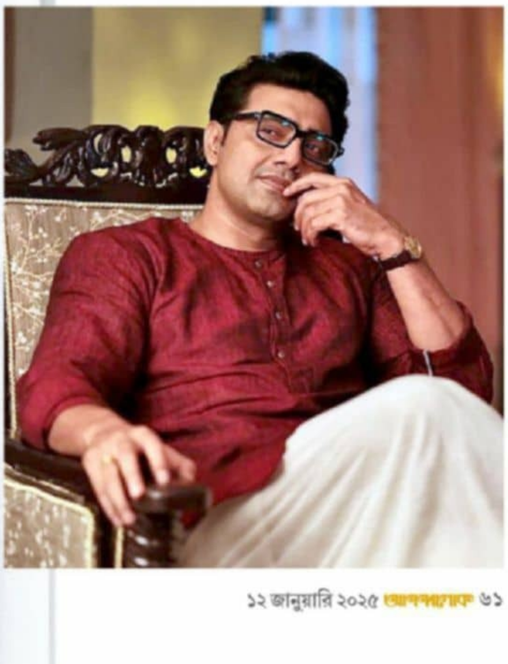
বর্তমানে তিনি ব্যস্ত তাঁর নতুন ছবি 'বিনোদিনী'র প্রচার নিয়ে। এদিকে তাঁর বিশেষ বন্ধু দেবের ছবি 'খাদান' একের পর এক রেকর্ড সৃষ্টি করছে। বাংলা কমর্শিয়াল ছবির বাজারে শোরগোল ফেলে দিয়েছে এই ছবি। কিন্তু তবুও এখন অবধি (এই লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত) 'খাদান' দেখা হয়নি রুক্মিণী মৈত্রের। কারণ তিনি নাকি ছবির টিকিট পাচ্ছেন না। "এই ছবি রিলিজ়ের পর থেকেই চেষ্টা করছি রাতের শোয়ে সিনেমাটি দেখার। কিন্তু যেদিনই যাচ্ছি দেখছি সর্বত্র হাউজ়ফুল। যদিও আমি তাতে খুব খুশি। আমি চাই এরকমভাবেই যেন টিকিট না পাই। আর 'খাদান'-এর প্রচার পরিকল্পনায় আমার অনেক অবদান রয়েছে," জানান রুক্মিণী।



শিবপ্রসাদ। দেব (ইনসেটে)

হুমকি পেলেন শিবপ্রসাদ

হুমকির মুখে সস্ত্রীক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। দেবের সঙ্গে একই দিনে মুক্তি পেয়েছিল (‘টেক্কা’ ও ‘বহুরূপী’) তাঁর ছবি। এটাই তাঁদের দোষ। প্রথমে সমাজ মাধ্যমে দেব ভক্তদের রোষের মুখে পড়েন পরিচালক তথা অভিনেতা শিবপ্রসাদ। এরপর তাঁর স্ত্রী জিনিয়ার অর্ধনগ্ন ছবি পোস্ট করা হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। দ্রুততার সঙ্গে রবীন্দ্র সরোবর থানায় লিখিত অভিযোগ জানান তাঁরা। এরপর ভবানী ভবনেও যান। লালাবাজারে সাইবার অপরাধদমন বিভাগেও অভিযোগ দায়ের করেছেন। সমস্ত বিষয়টাই খতিয়ে দেখছেন উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তারা। টলিপাড়ার সকলেই এই জঘন্য ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের। কিন্তু শিবপ্রসাদ ও তাঁর স্ত্রী জিনিয়ার ক্ষোভ, এ ব্যাপারে কেন এখনও মুখ খোলেননি দেব। এখন ‘খাদান’ হিট করায় তাঁর ফ্যানক্লাবের সদস্যরা শিবপ্রসাদকে হুমকি দিচ্ছেন, ভবিষ্যতে যেন একই দিনে ছবি রিলিজ় করার ‘ভুল’ না করেন তিনি!



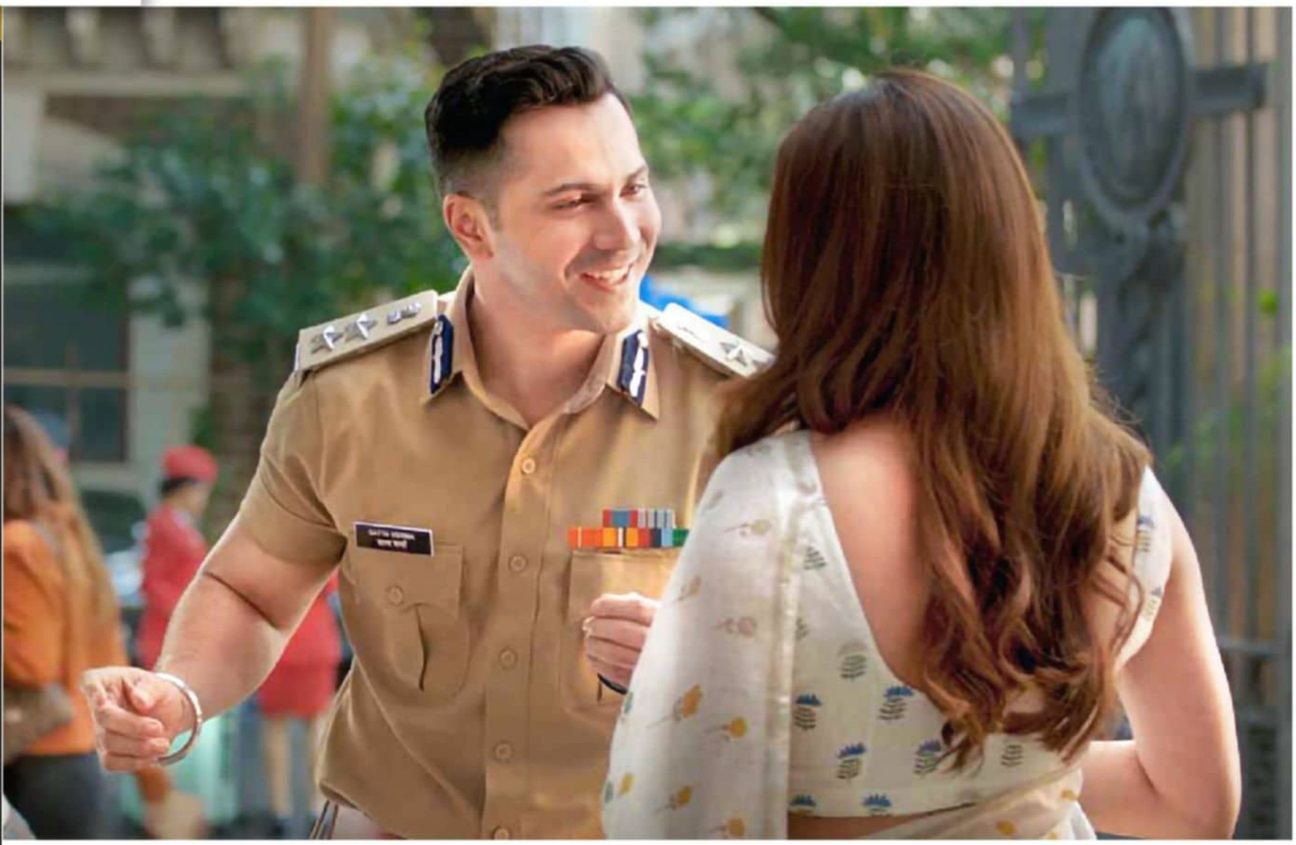
সেই চিরাচরিত রিপু

টেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট

মিস আঙুরলতা

হ্যাপি নিউ ইয়ার ফোক্স... আবার পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে ফেলল। আবার একটা নতুন বছর এক বছরের বেশি টিকল না। কিন্তু তাও শুভেচ্ছা তো জানাতেই হয়। সেই চিরাচরিত ঘটনার জন্য বছরের পর বছর একই শুভেচ্ছা। আসলে চিরাচরিত ঘটনা তো আমাদের চারপাশে অহরহ ঘটে চলেছে, তার যেমন কোনও পরিবর্তন নেই, বাকি কিছুরই বা থাকবে কেন? সময় শুধু চলিয়া যায়, শুধু এই তারাভরা আকাশের বাবুবিবিদের কাম, ক্রোধ, মোহ, ঈর্ষার মতো রিপুগুলো কিছুতেই অবদমিত হয় না। কিছুদিন আগে খনি সংক্রান্ত একটা ছবির সাফল্যের উদ্‌যাপনে দেখলাম পরমপূজ্যপাদর হৃদয় কতটা বড়। মমতাময়ী অভিনেত্রীর মোহময়তার প্রস্তাবে সে তার হৃদয় দুয়ারখানি হাট করে খুলে রেখেছে। অবশ্য সেই প্রকোষ্ঠে সবচেয়ে বেশি স্থান তার লক্ষ্মীশ্রীর। আর লক্ষ্মী সেটা জানে বলেই, সেই প্রকোষ্ঠে আর কাউকে ঢুকতে দিতে নারাজ। তাই যখনই মমতাময়ী পরমপূজ্যপাদর ধারে কাছে আসছে, লক্ষ্মীশ্রী যেন চোখের চাহনিতেই সব ভস্ম করে দিতে চাইছিল। আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম, মমতাময়ীর এই ক্ষুদ্র কেরিয়ারটাকে নিয়েও না সে টানাটানি করে। আসলে ক্রোধ খুব অদ্ভুত জিনিস। কখন যে কার উপর কিভাবে বর্ষিত হবে, কেউ জানে না। মনে আছে বেশ কিছুদিন আগে বন্দুকবাজ নায়ক তার আগামী ছবির গোপন দৃশ্য ভাইরাল করে দিয়েছিল বলে, পরিচালক বাদশা রীতিমতো ক্ষেপে গিয়ে তার বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিল? এখন শোনা যাচ্ছে বন্দুকবাজ নাকি কাজটা এমনি এমনি করেনি। তার নাকি কোন এক জ্যোতিষী আছে, যে বন্দুকবাজকে বলেছিল, ওই নির্দিষ্ট সময় এরকম কিছু 'ছেড়ে' দিতে পারলেই নাকি তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। এই 'ছাড়া' মানে জ্যোতিষ মশাই নিশ্চয়ই কোন ত্যাগের কথা বলেছিলেন। লোকে মনোবাসনা পূরণের জন্য হরিতকী ছাড়ে। বন্দুকবাজ সিনই ছেড়ে দিলেন! এই কথা এখন বাইরে আসার পর ক্রোধের রিপুতে আরও বেশি জ্বলছে পরিচালক বাদশা। সে বলেছে নতুন বছরের রেজোলিউশন বাজে কথা। সে বন্দুকবাজের শেষ দেখে ছাড়বে। অবশ্য বাদশার কেরিয়ারের যে অবস্থা, তাতে কে যে কার শেষ দেখে, কে জানে। আসলে রিপুর বাড়বাড়ন্ত চারিদিকে। কিছুদিন আগে আমার প্রিয় পত্রিকার একটি সাক্ষাৎকারের রিল খুব ভাইরাল হয়েছে। সেখানে পরিচালক সম্রাট যেভাবে আঁতেল বলে সৃষ্টিঠাকুরকে ঠেস মেরেছে, তাতে হইচই পড়ে গিয়েছে চারিদিকে। পরিচালক সম্রাটের বক্তব্য তার সিনেমাই সেরা। সৃষ্টিকে নিয়ে বৃথাই লোকে আদিখ্যেতা করে। সে সম্রাটের বক্তব্য থাকতেই পারে। সৃষ্টিরও সেটাই মত। কিন্তু সে যে কেন সৃষ্টিকে খোঁচা মারতে গিয়ে ছাতাবাবুর কথা বলার স্টাইল নকল করল, সেটা কেউই বুঝতে পারছে না। তার মানে কি ছাতাবাবুর উপরেও সম্রাটের রাগ? রিপুর প্রভাব আদি অনন্ত। নতুন বছরের প্রভাব সেটা কাটাবে কী করে?





বেবি জন

দাগ কাটে না

4/10

পরিচালনা: কালিস
অভিনয়: বরুণ ধওয়ান, ওয়ামিকা গাব্বি, কীর্তি সুরেশ, জ্যাকি শ্রফ

এই ছবির টিজ়ার বাজারে আসার পর থেকেই ছবি ঘিরে তৈরি হয় কৌতূহল ও আগ্রহ। ২০১৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তামিল ছবি 'থেরি'র রিমেক এটি। 'থেরি'র পরিচালক ছিলেন অ্যাটলি। তাঁর একসময়ের সহকারী কালিস 'বেবি জন' পরিচালনা করেছেন। বরুণের মারকাটারি লুক, ধুন্ধুমার অ্যাকশন দৃশ্য, বরুণ-কীর্তির দুরন্ত নাচ, সলমন খানের ক্যামিও, কিছুই রক্ষা করতে পারল না 'বেবি জন'-কে। সিনেমার গল্প যদি সঠিকভাবে প্রেজ়েন্ট না করা হয়, তা হলে অন্য কোনও ফ্যাক্টরই যে কাজ করে না, তার সেরা উদাহরণ এই ছবি। ছবির গল্প বাবা-মেয়েকে নিয়ে। জন ডি'সিলভা (বরুণ) একটি বেকারি চালায়। তার মেয়ে খুশি (জারা জায়না)। শহর থেকে অনেক দূরে বাবা-মেয়ের নিরুপদ্রব যাপন। প্রত্যেকদিন মেয়েকে বাইকে করে স্কুলে পৌঁছে দেয় বাবা। গল্পে আসে ডিসিপি সত্য বর্মা (বরুণ)। অবিকল এক দেখতে জন এবং সত্য। তা হলে কি তারা একজন মানুষ নাকি দু'জন আলাদা? অতীতের কী কানেকশন রয়েছে তাদের? গল্পের প্লট ভাল হলেও, এই ছবিটা কেমন যেন দানা বাঁধতে পারে না। 'থেরি'-তে বরুণের চরিত্রটি করেছিলেন বিজয়। কিন্তু অরিজিনাল ছবিতে বিজয়কে যতটা দুর্দান্ত লেগেছিল, এখানে বরুণকে ততটাই ফিকে লেগেছে। খুব বেশি ছ্যাবলামো করে ফেলেছেন তিনি যার ফলে চরিত্রটার সিরিয়াসনেস লোপ পায়। ছবিতে নায়িকার কোনও গুরুত্ব নেই। জ্যাকি শ্রফের উপস্থিতি, লুকস, আলোড়ন সৃষ্টি করলেও, চরিত্রে কোনও গভীরতা নেই। কোনও চরিত্রকেই ঠিকমতো এস্টাব্লিশ করা হয়নি। সব কেমন যেন তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। সলমন খানের ক্যামিও খুব বিশেষ দাগ কাটেনি। থমন এস-এর মিউজ়িক মন্দ নয়, তবে গানগুলি একবার শোনার পর আর মনে থাকে না।

মোয়ানা টু

মন ছুঁয়ে যায়

5/10

পরিচালনা: ডেভিড ডেরিক, জেসন হ্যান্ড, ডানা লেডক্স মিলর
অভিনয়: ডনা লেদু মিলর, জরেড বুশ

মোয়ানার গল্পে এবং তার মোহময়ী দুনিয়ার আরও একবার স্বাগত সকলকে। ফিরে আসা আর নতুন কিছু আবিষ্কারের চমক, এই দুইয়ে মিলে মোয়ানা আবারও সকলের মন জয় করে নিয়েছে। প্রাণবন্ত মোয়ানার রহস্য দ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা আগের মতোই সুন্দর। অজানা সমুদ্রপথে মোয়ানার প্রতিটি পদক্ষেপ সিনেমার শেষ পর্যন্ত ধরে রাখবে দর্শকদের। মোয়ানার সাহসী পদক্ষেপ আগেরবারের মতো এবারেও প্রশংসনীয়। তবে কিছুই জায়গায় মনে হবে আগের বার সেই সব দৃশ্যগুলির বুনন আরও মজবুত ছিল। কোথাও গিয়ে মনে হবে গল্প সত্যিই কল্পনীয়। যা প্রথম পর্বে মনে হয়নি। প্রথম পর্বে মোয়ানার রহস্যময় যাত্রা আরও বেশি প্রাণবন্ত ছিল। এছাড়া গল্পে আরও খানিক সাসপেন্সের প্রয়োজন ছিল। অজানা দ্বীপে যেসব প্রতিকূলতার সম্মুখীন

সে হয়েছে, তাতে আরও চমক থাকলে গল্পের ভীত মজবুত হত। এত দিন পর্যন্ত সব অ্যানিমেটেড ছবিকে পিছনে ফেলে শীর্ষে ছিল মোয়ানা। এবারে অবশ্য সে আগের মতো একই জায়গা ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু সবুজ দ্বীপ মোতুফেতুতে মোয়ানার অ্যাডভেঞ্চার আর নতুন কিছু আবিষ্কারের তীব্র বাসনা, দর্শকদের ভাল লাগার মতোই।





মুফাসা: দ্য লায়ন কিং

ফিকে প্রিকোয়েল

5/10

পরিচালনা: ব্যারি জেনকিন্স
কণ্ঠ: আরন পিয়ের, ম্যাডস মিকেলসেন, ব্লু আইভি কার্টার, বেয়ন্সে, ডোনাল্ড গ্লোভার, জন কানি, বিলি ইকনার

নালা জন্ম দিচ্ছে সন্তানের। কিয়ারার দেখাশোনার দায়িত্ব সিম্বা দেয় টিমন ও পুম্বাকে। আর রাফিকি বলতে বসে মুফাসার গল্প। কীভাবে ছোট্ট মুফাসা বন্যায় পরিবারের থেকে আলাদা হয়ে যায়, কীভাবে তাকার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়... কিন্তু 'দ্য লায়ন কিং'-এর এই প্রিকোয়েলের গল্পটি বড্ড ক্লিশে এবং দীর্ঘ! ডিজ়নি বারবার চেষ্টা করছে তার পুরনো ক্লাসিকগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার। 'মুফাসা'র ক্ষেত্রে তা প্রিকোয়েলে পরিণত হয়েছে। ছবিটির ভাল দিক হল, প্রথমদিকে দুই সিংহশাবক মুফাসা ও তাকার খেলা, ভালবাসা বড়ই মিষ্টি লাগে। বিশেষত মুফাসা যেভাবে আউটসাইডার হয়েও শিকার করতে শেখে, জঙ্গলের জীবনের প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা গড়ে ওঠে তার। কিন্তু সাদা বাঘদের জোর করে প্রাইড ল্যান্ডের গল্পে যেভাবে ঢোকানো হয়েছে, তা বিরক্তিকর। সারাবি, জ়াজ়ি, রাফিকির চরিত্র গল্পে কেবল জটিলতা বাড়িয়েছে, সংযোজন কিছুই করেনি। সারাবির চরিত্র তো একেবারেই কাঁচা হাতে লেখা। ব্যারি জেনকিন্সের কিছু সিগনেচার স্টাইল দৃশ্যায়ণ থাকলেও 'মুফাসা' কোনওভাবে সিংহরাজার উচ্চতা ছুঁতে পারে না। বরং একটি মাঝারি মানে ডিজ়নি কনটেন্ট হয়েই থেকে যায়। এবার বোধহয় ক্লাসিকগুলোকে একটু রেহাই দেওয়া উচিত। ডিজ়নির ভাঁড়ারে গল্প কি কম পড়েছে?

ডেসপ্যাচ

অতি সাধারণ

4/10

পরিচালনা: কানু বেহল
অভিনয়: মনোজ বাজপেয়ী, সাহানা গোস্বামী, ঋ সেন, অর্চিতা আগরওয়াল

এই পরিচালকের আগের ছবি 'তিতলি' যারা দেখেছেন, তাদের 'ডেসপ্যাচ' নিয়ে আলাদা করে আগ্রহ তৈরি হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু কানু এবার হতাশ করলেন। ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজ়মের নামে জয় (মনোজ) যে স্ক্যামটি

ফাঁস করতে চান, এবং যেভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এসবের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তাতে আলাদা করে মোহিত হওয়ার মতো কিছু নেই। এই সাংবাদিককে ব্যক্তিগত জীবনে একেবারেই ভাল দেখাতে চাননি পরিচালক। নানা দোষ চরিত্রে ঢুকেছে। কিন্তু সেটিকে ইন্টারেস্টিংভাবে আখ্যানে ঢোকানো হয়নি। আড়াই ঘন্টার ছবি শেষ হওয়ার পরে নতুন করে কিছু রেশ দর্শকের মনে তৈরি হয় না। বোঝা যায় না, পরিচালক ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজ়মকে ঠিক কোন চোখে দেখেন। কারণ কোনও চরিত্র বা ঘটনা যত্ন নিয়ে লেখা হয়নি। সাংবাদিকের কাছে যে ক্লুগুলো আসছে, সেগুলোও যেনতেন প্রকারেন পর্দায় দেখানো হয়েছে। কোনও মহিলা চরিত্রই ভালভাবে লেখা নয়। এই ছবিটি শুধু দেখা যায় মনোজ বাজপেয়ীর অভিনয়ের জন্য। তাছাড়া মনে রাখার মতো আর কিছু নেই। বিশেষ করে মনোজ এই ছবিটি কেন বাছলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কারণ ফ্যামিলি ম্যানের মতো কাজ তিনি ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। এই ছবি তাঁর কেরিয়ার গ্রাফকে বিশেষ উন্নত করবে না।



লাকি ভাস্কর

রিলেট করা যায়

পরিচালনা: ভেঙ্কি অতলুরি
অভিনয়: দুলকর সলমন, মীনাক্ষি চৌধুরী



7/10

আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে সিরিজ় বা সিনেমার চাহিদা বরাবরই বেশি। অনেকটা সেই ছকেই পরিচালক ভেঙ্কি অতলুরি বানিয়েছেন ‘লাকি ভাস্কর’। ছবিটি একজন সাধারণ মানুষের এক প্রকার বাধ্য হয়ে দুর্নীতির রাস্তা বেছে নেওয়ার গল্প। এই মানুষটি, মানে, ভাস্করের (দুলকর) সঙ্গে মিল খুঁজে পাবেন অনেকেই। আটের দশকের শেষে মুম্বইয়ের মগধা ব্যাঙ্কের কর্মী ভাস্কর। কাজের জগতে দারুণ সুনাম। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত প্রোমোশন অধরাই থাকে তার। ওদিকে ক্রমবর্ধমান দেনা, অর্থিক দুরবস্থার জন্য বারবার স্ত্রী-সন্তানকে অপমানিত হতে দেখা এমনকি শেষে দেনার দায়ে একমাত্র সম্বল স্কুটার চলে যাওয়া...এসবই ভাস্করকে বাধ্য করে ভিন্ন পথে টাকা রোজগারে। দৈবাৎ সুযোগও এসে যায়। কিন্তু ঠিক অসৎ উপায় যে সে অবলম্বন করে, তা বলা যায় না। বরং খানিক বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের অবস্থা বদলে ফেলে ভাস্কর। ভাগ্যও সঙ্গ দেয়। ব্যাঙ্কে সে সময়ে কোনও ক্যামেরা থাকলে ধরা পড়তে দু’মিনিটও লাগত না তার! ছবি দেখতে দেখতে এক ধরনের নেগেটিভ অ্যাস্পিরেশন তৈরি হতে পারে দর্শকের। যে ভাস্কর গাড়ি ভাড়ার অভাবে হেঁটে অফিস যেত, দিনের পর দিন সেরা এমপ্লয়ি হয়েও ৬০০০ টাকা মাইনেতে আটকে ছিল, সেই এখন নতুন বাড়ি, গাড়ি, ঝাঁ চকচকে বিত্ত বৈভবের জীবন বাঁচছে! এই বৈভবের অভ্যেস কি তার জীবনের মোড় ঘোরাবে? তবে গল্পটি শুধুমাত্র একজন মানুষের গলি থেকে রাজপথে উত্তরণের নয়। ছবির অন্যতম উপজীব্য ভাস্কর ও সুমতির (মীনাক্ষি চৌধুরী) সম্পর্ক। পরিবারের জন্যই তো এত ঝুঁকি নিয়েছে সে। ছবিতে হর্ষদ মেহতার রূপান্তরিত নাম হর্ষ মেহরা। কিন্তু তাকে কখনও দেখা যায়নি। পরিচালক চাননি গল্প চেনা ছকের ভিতর ঢুকে পড়ুক। বরং, ভাস্করকে কেন্দ্রে রেখে তিনি একের পর এক সাসপেন্সের মুহূর্ত তৈরি করেছেন। ভাস্করের চরিত্রে দুলকর ছাড়া আর কাউকে ভাবা সম্ভবই ছিল না বোধহয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত যাপন থেকে বিত্ত-বৈভবের প্রভাবে বদলে যাওয়া মানুষ, চরিত্রের যাবতীয় দ্বন্দ্ব কী অনায়াসে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। মীনাক্ষিও বেশ ভাল। ছবিতে কিছু কিছু খামতি থাকা সত্ত্বেও পরিচালক ভেঙ্কির এটাই এখনও অবধি সেরা কাজ।

গার্লস উইল বি গার্লস

অভিনব এবং অনন্য

পরিচালনা: সূচি তালাতি
অভিনয়: কানি কুসরুতি, প্রীতি পাণিগ্রাহী, কেশব বিনয় কিরণ

7.5/10

আলি ফজ়ল এবং রিচা চড্ডার প্রথম প্রযোজনা ‘গার্লস উইল বি গার্লস’ অভিনব অনেক দিক থেকে। এই ছবির জন্য বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে তাঁরা গ্রান্ট পেয়েছিলেন মহিলা গ্যাফারদের (যাঁরা লাইটিং বিভাগে কাজ করেন) প্রশিক্ষণের জন্য। একটি ‘অল গার্লস ক্রু’ তৈরি করেছেন। তবে নেপথ্যের এই উদ্যোগগুলো ফিকে হয়ে যেত সিনেমাটি সেই মানের না হলে। বোর্ডিং স্কুলের টপার, প্রিফেক্ট ১৬ বছরের মীরা (প্রীতি) টলমলিয়ে ওঠে যখন তার জীবনে সহপাঠী শ্রী (কেশব) আসে। বয়ঃসন্ধির মীরার যৌনতার অনুসন্ধান, মা অনিলার (কানি) সঙ্গে টানাপড়েন এবং অবশেষে নারী হিসেবে চেতনা এই ছবিকে অভিনব করে তোলে আরও বেশি করে।

টিনএজ সেক্সুয়ালিটিকে ‘মেল গেজ়’-এর ছোঁয়া থেকে দূরে রাখা খুব কঠিন কাজ। সেই কাজটি করে দেখিয়েছেন পরিচালক সূচি তালাতি। একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে মা-মেয়ের সম্পর্ক, যৌন আকাঙ্ক্ষাকে দেখানো সম্ভব, তা সূচি শেখাতে পারেন। কানি কুসরুতির অভিনয় ‘অল উই ইম্যাজিন অ্যাজ় লাইট’-এ আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত, এই ছবিতেও তিনি অনবদ্য। কখনও মেয়েকে শাসন করছেন, কখনও পায়ের ওয়্যাক্সিং করে দিচ্ছেন, কখনও তার বয়ফ্রেন্ডকে নিজের ছেলের মতো প্রশ্রয় দিচ্ছেন। প্রীতি তো প্রথম ছবিতেই অবাক করে দিয়েছেন। অল্পবয়সের মেয়েদের মধ্যে মায়ের সঙ্গে যে ‘সিবলিং রাইভ্যালরি’র ভাব তৈরি হয়, তা দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভাল লাগে শ্রীনিবাসের চরিত্রে কেশবকেও। বোর্ডিং স্কুলে জীবন নিয়ে নাগেশ কুকুনুর বানিয়েছিলেন ‘রকফোর্ড’, যা স্কুলের অভ্যন্তরের ভিন্ন চিত্র সামনে এনেছিল। এই ছবিটি আরও অন্যরকম এবং গভীরতর গল্প বলে। নিঃসন্দেহে ‘গার্লস উইল বি গার্লস’ একটি মর্মস্পর্শী অনন্য অভিজ্ঞতা।





স্কুইড গেম সিজ়ন ২

মানবিক, কিন্তু অচেনা

শো-রানার: হয়াং ডং হ্যুক
অভিনয়: লি জং জে, লি ব্যুং হুন, ইম সি ওয়াং

5/10

নেটফ্লিক্স-এর ‘স্কুইড গেম’ সম্ভবত বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় সিরিজ়। ফলে প্রথমের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় সিজ়নটি এসেছে। এখানে গি-হুন (লি জং-জে), ওরফে প্লেয়ার ৪৫৬ এটি শেষ করার উপায় খুঁজে নেওয়ার জন্য আবার গেমসের অংশ হয়ে ওঠে। জিতে পাওয়া অর্থ নিয়ে গেমের মাস্টারমাইন্ডকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। নতুন সাত এপিসোডের এই সিরিজ়ে গেমস মুখ্য ভূমিকা নেয় বটে, কিন্তু চরিত্রগুলোকেও খুব মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা হয়েছে। তাতে একটি অন্য মাত্রা যোগ হয় বটে, কিন্তু সিরিজ়ের মূল রস ক্ষুণ্ণ হয়। এই সিজ়নটি হয়তো আগেরটির জনপ্রিয়তার জোরে সফল হবে। কিন্তু কোথাও গিয়ে পরেরটায় মানুষ মূল মজাটা খুঁজে পেতে চাইবে।



ইনস্টল করে সাবস্ক্রিপশন করলেই আপনার জন্য থাকছে এমনই পডকাস্ট-সহ বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।

AARO ANANDA available on

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

https://www.facebook.com/aaroananda ওয়েবসাইট aaroananda.com

আরও আনন্দ

যা কিছু বাঙালির

An ABP Initiative

ANANDALOK 12 JANUARY 2025 REGISTERED KOL RMS/239/2022-2024, RNI NO.27039/74 INR 35.00

